গোবিন্দ-মন্দির

সামাজিক উপন্যাস

আশ্বিন ১৩৫৪

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ দাশ মজুমদার

উৎসর্গ।

গোবিন্দ-ভক্ত,—সাধু

পরম পূজনীয় পিতৃদেব

স্বর্গীয়

দুর্গাচরণ দাশ মজুমদার

মহাশয়ের

পবিত্র স্মৃতি-উদ্দেশে

এই ভক্তি-অর্ঘ্য

জীবন-সন্ধ্যায়

অর্পণ করিলাম।

সেবকাধম—

গঙ্গাপ্রসাদ।

গোবিন্দ-মন্দির

(সামাজিক উপন্যাস)

১

হরিদাস যখন মধ্যাহ্ন-আহারান্তে গোঁসাই বাড়ীর বৈঠকখানার তক্তপোষের এক প্রান্তে উপবেশন করিয়া ধূম-পান করিতেছিল, আর সেই তাম্রকূটের ধূমরাশি ধীরে ধীরে তাহার মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করিয়া চক্ষুর্দ্বয়ের উপর দিবা-নিদ্রার ছায়া ঘনাইয়া তুলিতেছিল, সেই সময় অষ্টাদশ-বর্ষীয়া বিধবা ভগ্নী রাধারাণী তাহার হস্তে দুইটি পানের খিলি দিয়া সন্ত্রস্তভাবে বলিল, "দাদা, তুমি যে আজ একটা সর্ব্বনাশের কাজ ক'রে বসেছ।"

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিল, "এমন কি সর্ব্বনেশে কাজ করে ফেল্লেম রাধি?"

কনিষ্ঠা ভগ্নী রাধারাণী বলিল, "তুমি নাকি আজ ঠাকুর-ঘরে ঢুকেছিলে?"

রাধারাণীর কথা শুনিয়া হরিদাস অধিকতর বিস্ময়াবিষ্ট-ভাবে ভগিনীর ম্লান মুখের উপর চাহিয়া রহিল; তাহার হস্তস্থিত পান বা তামাক আর সেবন করা হইল না। সে বামহাতের হুঁকাটি মাটীতে রাখিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "যদি সত্য সত্যই ঠাকুরঘরে ঢুকে থাকি, তাতে এমন কি দোষ হয়েছে, যাতে একটা সর্ব্বনাশের কাজ হয়ে পড়েছে!"

রাধারাণী এবার একটুকু শান্তভাবে বলিল, "তুমি যে তাতে ঘোরতর অপরাধী হয়েছ দাদা। এ যে আমাদের গুরুবাড়ীর ঠাকুর। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোন হিন্দুর গোবিন্দজীর ঘরে ঢুকবার অধিকার নাই।"

হরি: আমি যদি গোবিন্দজীর মন্দিরে ঢুকে অপরাধী হয়ে থাকি, সেই অপরাধের মধ্যে সর্ব্বনাশের কোন কারণ তো দেখতে পাচ্ছি না। আর আমার অপরাধে অন্যের কোন অনিষ্ট হবারও কোন কারণ হ'তে পারে না। আমার অপরাধে একা আমারই অনিষ্ট হবার কথা, তজ্জন্য আমি ভীত নই।

রাধা। অন্যের অনিষ্ট হয়েছে বৈকি! গোবিন্দজী যে অশুচি হয়ে পড়েছেন। এখন গোবিন্দজীকে পুনরায় অভিষেক করাতে হবে। সেই খরচপত্র প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তোমাকেই দিতে হবে। তাই গোঁসাই প্রভু বাড়ীর ভিতর ব'সে অন্যান্য শিষ্যগণ নিয়ে একটা বড় ফর্দ্দ প্রস্তুত করছেন।

হরি। অপরাধীর প্রায়শ্চিত্ত না ক'রে গোবিন্দজীর

প্রায়শ্চিত্ত করা, এ যে বিষম ব্যবস্থা। আচ্ছা, গোবিন্দজীর অভিষেকে কি কি জিনিষ দরকার হবে তা জানিস্ কি রাধি?

রাধা। শুনেছি, পঞ্চগব্য সহ সোণা, রূপা, মধু, এই মত আরো অনেক জিনিষ লাগবে। নৈবেদ্যাদি দ্বারা ষোড়শোপচারে পূজা দিতে হবে। ইহা ছাড়া এই উপলক্ষে কত মণ চাউলের নাকি একটা মহোৎসবও করতে হবে।

হরি। ফর্দ্দে কত মণ চাউল ধরা হয়েছে তা শুনেছিস্ কি?

রাধা। এখনো ঠিক জানতে পারি নাই। তবে ওদের কথাবার্ত্তা ও ভাবভঙ্গিতে বুঝতে পারলেম, বিশ কি পঁচিশ মণের কম হবে না।

হরি। তা হলেই কি গোবিন্দজী শুচি হবেন?

রাধা। শুধু গোবিন্দজী কেন, ঠাকুর-মন্দির পর্য্যন্ত শুদ্ধ হয়ে যাবে। নূতন অভিষেক না হওয়া পর্য্যন্ত গোবিন্দজীর পূজা ও সেবা বন্ধ থাকবে। তাই এত তাড়াতাড়ি ফর্দ্দ ধরা হচ্ছে। তুমি ত বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রয়েছ।

হরি। কথাগুলি আমার নিকট আশ্চর্য্য ব'লে বোধ হচ্ছে রাধি! গোবিন্দজী ভগবানের বিগ্রহ। ভগবান সর্ব্বত্র সকল সময়েই পবিত্র। তিনি কখনো অশুচি বা অশুদ্ধ হ'তে পারেন না। যিনি চিরশুদ্ধ, চিরপবিত্র, তাঁকে পুনরায় শুদ্ধ বা পবিত্র করবার তো কোন দরকার দেখছি না। আচ্ছা রাধি, আমি জিজ্ঞাসা করছি ঐ গোবিন্দজী কি একা

ব্রাহ্মণেরই গোবিন্দজী, না, এই দুনিয়ার সকল শ্রেণীর হিন্দুরও গোবিন্দজী ?

প্রশ্ন শুনিয়া রাধারাণী একটুকু হাসিয়া উত্তর করিল, "আমি মেয়েমানুষ, ওসব কঠিন তত্ত্ব আমি কি ক'রে বুঝব দাদা ! গোঁসাই প্রভু উপদেশচ্ছলে সময় সময় শিষ্য ও শিষ্যা-দিগকে ব'লে থাকেন যে তাঁহার বাড়ীর গোবিন্দজী কেবল তাঁহারই। আর গোঁসাই প্রভুই স্বয়ং শিষ্য ও শিষ্যাগণের নিকট গোবিন্দজীরূপে বিদ্যমান।

হরিদাস একটুকু চিন্তা করিয়া বলিল, "আমি তো গোবিন্দজীর মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করি নাই; আর গোবিন্দজীকেও তো 'স্পর্শ' করি নাই। স্নান ক'রে শুচি হয়ে এসে গোবিন্দজীর চরণামৃত গ্রহণ করতে যেয়ে দেখলেম, অন্য দিনের মত চরণামৃত-পাত্রটি দরজার সম্মুখে রাখা হয় নাই। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে এক পা বাহিরে রেখে অন্য পা-খানি মন্দিরের ভিতর সামান্য প্রবেশ করায়ে পাত্রটি সম্মুখে টেনে আনতে হয়েছিল। গুরুপাটে আসিলেই তিন রাত বাস করতে হয়, তাই আজকার রাতটাও এখানে কাটাতে হবে। এত ঝকমারি আগে জানলে যে দিন এসেছিলেম সেই দিনই তোকে দেখা দিয়ে চলে যেতেম। কিন্তু রাধি, বল্ দেখি, তুই কি করে সেইদিন গোবিন্দজীর মন্দিরে ঢুকে ঘর পরিষ্কার করছিলি ? যদি তুই মন্দিরে ঢুকতে পারিস্ তবে আমি ঢুকতে পারব না কেন ?"

এবার রাধারাণীর মুখ একটুকু মলিন হইয়া উঠিল। সে একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া লইয়া শেষে ভ্রাতার কাণের নিকট মুখ রাখিয়া বলিল, "চুপ কর দাদা---চুপ কর। ওকথা মুখে কখনো এনো না। যা দেখেছ তা মনে মনে রেখো। অন্য লোকের কাণে গেলে গোঁসাই প্রভুর মান-সম্ভ্রম নষ্ট হবে। তাঁকে সমাজে এক-ঘরে' হ'য়ে থাক্‌তে হবে। গোঁসাই প্রভু স্বপ্নে দেখেছেন, পূর্ব্বজন্মে আমি নাকি বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীগোবিন্দের অন্যতম সেবাদাসী ছিলেম। তাই এবারও তাঁর সেবাদাসী হবার কতকটা অধিকার পেয়েছি। তবু গোবিন্দজীকে স্পর্শ কর্‌বার অধিকার এখনো আমার হয় নাই। কেবল মন্দিরে ঢুকে মন্দির পরিষ্কার কর্‌বার ক্ষমতাটুকু হ'য়েছে মাত্র। এই কাজ প্রত্যহ এত গোপনে ক'রে থাকি যে, উহা এখন পর্য্যন্ত কেহ টের পায় নাই। তুমি কি ক'রে দেখ্‌লে দাদা?"

হরি। ঐ ভাঙ্গা জানালার ফাঁক দিয়ে দেখেছিলেম। তা যা হ'ক রাধি, আমার মনে একটা খট্‌কা লেগে গেল। আমি এতদিন জান্‌তেম যে, গোবিন্দজী স্বয়ং ভগবান। সেই ভগবান কখনো একা ব্রাহ্মণের হ'তে পারে না। ভগবানের নিকট সাম্প্রদায়িকতা বা ছোট-বড় নাই। তিনি কখনো পক্ষপাত-দুষ্ট নহেন। গোঁসাই বাড়ীর গোবিন্দজী যে পক্ষপাত-দুষ্ট ইহা বিশ্বাস কর্‌তে প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

রাধা। আমি তো পূর্ব্বেই ব'লেছি আমি মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষের পক্ষে ওসব কঠিন কথা বুঝা সম্ভব নয়।

গোঁসাই প্রভু আমাকে যাহা বুঝান, তাই বেদবাক্য ব'লে গ্রহণ ক'রে থাকি। শুনেছি, গুরু আর গোবিন্দজীতে কোন প্রভেদ নাই। তবে এখন আমি আসিগে। তোমাকে সতর্ক করবার জন্যই পূর্ব্ব হ'তে সব ঘটনা বলে রাখলেম। গোঁসাই প্রভু যখন তোমাকে ডেকে ঐ অপরাধের কথা ও তাহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা জানাবেন, তখন উচিত জবাব দিবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে থেকো।

ইহা বলিয়া রাধারাণী চলিয়া যাইবার জন্য উদ্যতা হইলে হরিদাস তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "আর একটা কথা শুনে যা রাধি। আচ্ছা, আমি যে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ ক'রেছি, তা কে দেখতে পেয়েছে? আর গোঁসাই প্রভুই বা জানলেন কি ক'রে?"

রাধা। গোঁসাই প্রভু নাকি নিজেই দেখেছেন।

হরি। তবে সে সময় তিনি আমাকে এই অপরাধের কথা ডেকে বল্লেন না কেন?"

রাধা। শত হ'লেও তুমি তার শিষ্য। তখনো তুমি প্রসাদ পাও নি, অভুক্ত ছিলে। সেইরূপ অসময়ে হঠাৎ শিষ্যের মনে আঘাত করা তিনি ভাল মনে করেন নাই। তাই বৈকাল-বেলায় বোধ হয় তোমাকে ডেকে বল্‌বেন। এখন তুমি একটু বিশ্রাম করগে।

ইহা বলিয়া রাধারাণী বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। হরিদাস কতক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনরায় তামাক-সেবন করিতে

ইচ্ছা করিল; কিন্তু যখন দেখিল, কল্কের আগুন একেবারে নিবিয়া গিয়াছে, তখন আবার হাঙ্গামা করিয়া আগুনের চেষ্টা করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সেই সময় তাহার মনের গতিও খারাপ ছিল। তাই তামাক সেবনে নিরস্ত হইয়া হস্তস্থিত পান দুইটি চিবাইতে চিবাইতে সেই তক্তপোষের একধারে শুইয়া পড়িল।

বিক্রমপুর পরগণার দ্বিপাড়া গ্রামে ঈশ্বর মণ্ডলকে সকলে ধনাঢ্য বলিয়া জানিত। নিকটবর্ত্তী আবদুল্লাপুর ও তালতলা বন্দরে তাঁহার বড় বড় দুইটি গদি ছিল। প্রথম বয়সে সে সরিষা তৈলের হাঁড়ি মাথায় করিয়া পাড়ায় পাড়ায় তৈল বিক্রী করিত। এইরূপ কায়ক্লেশে প্রচুর ধনসঞ্চয় করিয়া শেষে নানাবিধ জিনিষের কারবার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু দেশের লোকে বুঝিয়াছিল যে, ঈশ্বর মণ্ডল নিশ্চয়ই কোন 'গুপ্তধন' প্রাপ্ত হইয়াছে। একদা তাঁহার বাড়ীর পশ্চিম দিকের বাগানে একটি প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষের নিম্নদেশে গভীর গর্ত্ত দেখিয়া গ্রামস্থ কেহ কেহ প্রচার করিয়াছিল যে, ঈশ্বর মণ্ডল ঐ বৃক্ষমূলেই বহু স্বর্ণমুদ্রা-পূর্ণ পিত্তলের কলসী পাইয়া তাহা দ্বারা তৎকালীন দুইটি প্রধান বন্দরে বড় বড়

দোকান খুলিতে সমর্থ হইয়াছিল। গ্রামের লোক ঈশ্বর মণ্ডলকে কৃপণ বলিয়া জানিলেও সে নিজ বসত-বাড়ীখানা যথেষ্ট ব্যয় করিয়া সুন্দরভাবে সাজাইয়াছিল। ভিতর-বাড়ীব উত্তব ও পূর্ব্ব ভিটিতে বড় দুইটি পাকা একতালা দালান ও অন্য দুই ভিটিতে বড় দুইটি টিনের ঘর প্রস্তুত কবিয়াছিল। বহির্বাটীব চারি ভিটিতে চারিখানা প্রকাণ্ড টিনের ঘর ছিল। বাড়ীতে একটি পুকুর ও চতুঃপার্শ্বে নানাবিধ ফল ও ফুলেব বৃক্ষাদি ছিল। বাড়ীখানা দেখিতে কোন ধনশালী বণিকেব বাড়ী বলিয়াই বোধ হইত।

ঈশ্বব মণ্ডল জাতিতে ছিলেন তিলী। তাঁহার কন্যা রাধারাণীর বয়স যখন ৫ বৎসর, তখন তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়। ইহার পব হইতেই সে যেন দিন দিন নিস্তেজ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতে লাগিল। নবম বর্ষীয় পুত্র হরিদাস সেইসময় আবদুল্লাপুব স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিল। ঈশ্বব মণ্ডল তাহাকে তাড়াতাড়ি স্কুল হইতে উঠাইয়া আনিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ শিখাইতে লাগিল। গৌরীদানেব ফলের লোভেই হউক, বা অন্য কোন কাবণেই হউক রাধা-রাণীকে অষ্টম বৎসর বয়সের সময় পাত্রস্থ করিয়া, পুত্র হরিদাসের জন্য একটি সুশ্রী পাত্রীর অনুসন্ধান করিতেছিল। গ্রামস্থ লোক ও গদির কর্ম্মচারীগণ তাঁহাব এই সব কাজকর্ম্ম ও মনেব গতির একটা পরিবর্ত্তন অনুভব করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ঈশ্বর মণ্ডল হয় তো শীঘ্রই সংসার ত্যাগ

করিয়া কোন তীর্থ-উদ্দেশে যাত্রা করিবে। স্ত্রী-বিয়োগে অধীর হইয়াই যে সে এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিতেছে ইহা কাহারো বুঝিবার বাকী রহিল না। পুত্র ও কন্যা ছাড়া সংসারে তাঁহার দূরসম্পর্কীয়া এক বৃদ্ধা ভগ্নীও ছিল।

রাধারাণী ছিল খুব সুন্দরী। কাঁচা হরিদ্রার ন্যায় ছিল তাহার শরীরের রঙ। নাক, মুখ ও চোখের গঠন ছিল অতি চমৎকার। ভ্রূদ্বয় ছিল যেন তুলি দ্বারা আঁকা। পিত্রালয়ে সে সামান্য বাঙ্‌লা লেখাপড়া শিখিয়াছিল; কিন্তু শ্বশুরালয়ে চারি বৎসরের মধ্যে সে অনেক বেশী লেখাপড়া শিখিতে পারিয়াছিল। দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় সে ভালমত চিঠিপত্র লিখিতে ও পড়িতে পারিত। সে অবসরমত শ্রীমদ্ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিত। তাহার মুখে সেই পাঠ খুব মধুর শুনাইত। পাড়ার রমণীগণের মধ্যে অনেকেই বৈকালবেলায় রাধারাণীর নিকট পাঠ শুনিতে আসিত। রাধারাণী সেই সব পাঠের কোন ব্যাখ্যা করিত না, কারণ সে নিজেই সেই সব পাঠের অর্থ বুঝিতে সমর্থা ছিল না। কেবল গ্রন্থগুলি পড়িয়া যাইত। তবু পাড়ার রমণীগণ তাহার পাঠের খুব অনুরক্তা ছিল। ষোড়শ বর্ষীয় স্বামী শচীনাথ গ্রাম হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা মেডিকেল স্কুলে পড়িতেছিল। তখন ডাক্তারি শিক্ষা করিয়া নেটিভ ডাক্তার হইবার জন্য এণ্ট্রেন্স পাশের দরকার হইত না।

রাধারাণীর শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা খুব ভাল ছিল। খাওয়া, পরা ও শ্বশুর-শাশুড়ীর আদর-যত্ন লাভ করার পক্ষে কোন ত্রুটি ছিল না। পাড়ার সকলেই তাহাকে ভালবাসিত।

সুখ-সম্পদ কাহারও ভাগ্যে চিরস্থায়ী হয় না। রাধারাণীর ভাগ্যেও তাহাই হইল। হঠাৎ একদিন দিবা দ্বিপ্রহরে বাড়ীর পরিবারবর্গের করুণ ক্রন্দনের মধ্য দিয়া সে জানিতে পারিল যে, তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। সে এই দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিবামাত্র বৈধব্যকে আলিঙ্গন করিয়াছে। ঢাকা হইতে টেলিগ্রাফ আসিয়াছে তাহার যুবক স্বামী শচীনাথ মাত্র তিন ঘণ্টাকাল কলেরা রোগে ভুগিয়া মিটফোর্ড হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

যদিও চারি বৎসর হইল রাধারাণীর বিবাহ হইয়াছে, তবু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে "স্বামী ও ভালবাসা" এই তুইটি জিনিষ যে কি তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল না। উহার আস্বাদন এইমাত্র অল্প কয়েকমাস হইল সে কিছু কিছু পাইতেছিল। তাহার ঐ ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর মধ্যে তাহারই অজ্ঞাতসারে কে যেন প্রেমের বীজ বপন করিতেছিল। এখন সে বুঝিতে পারিতেছিল যে, কেবল পিতা, মাতা বা শ্বশুর-শাশুড়ীই তাহার পূজনীয় লোক নয়। পূজা করিবার তাহার আর একটি পাত্র আছেন—তিনি তাহার স্বামী "শচীনাথ"। তাই সে লজ্জা-সরম ত্যাগ করিয়া শচীনাথের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই পত্রগুলি প্রায়ই প্রেম ও ভক্তির কথায় পূর্ণ

থাকিত। শচীনাথের নিকট হইতে পত্র পাইলে রাধারাণী তাহা প্রথমতঃ কপালে স্পর্শ করাইয়া উহা পাঠ করিত। এইভাবে তিনবার পাঠ না করিলে তাহার তৃপ্তি হইত না। এখন সে ক্রমশঃ হৃদয়ঙ্গম করিতেছিল যে, তাহার একজন অতি নিকট আত্মীয়, অতি দরদী ও অতি ভালবাসার মানুষ ঢাকাতে থাকিয়া ডাক্তারি শিক্ষা করিতেছে। স্কুল বন্ধ হইলেই তাঁহার প্রেমময় বাহুবন্ধনে সে আবদ্ধা হইতে পারিবে। সেই সুখ-মিলনের, সেই শুভ-সুযোগের অপেক্ষায় সে তাহার অফুরন্ত দিনগুলি গণিতেছিল। গতকল্যও সে স্বামীকে মাথার দিব্য দিয়া অবকাশের সময় একবার বাড়ী আসিতে অনুরোধ করিয়া একখানা অসম্পূর্ণ পত্র লিখিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহার দুরদৃষ্ট বশতঃ উহা সম্পূর্ণ করিয়া ডাকে পাঠান হইল না। উহা চিরজীবনের জন্য অসম্পূর্ণই রহিয়া গেল। রাধারাণী এতদিন তোতা পাখীর মত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু উহার অন্তর্নিহিত গভীর প্রেমের আলো তাহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিয়াছিল না। আজকাল সেই গ্রন্থে তাহার হৃদয়ের কথাগুলি সে অনেক খুঁজিয়া পাইতেছিল।

আজ স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাধারাণী কিছুতেই ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিল না। শ্বশুর-শাশুড়ী ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গের উচ্চ ক্রন্দনের সঙ্গে সঙ্গে সেও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে এইভাবে কাঁদিতে দেখিয়া পাড়ার

কতিপয় বর্ষীয়সী রমণী রাধারাণীকে বুঝাইতে লাগিল যে, স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর পক্ষে এত উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করা যে কেবল নির্লজ্জতাই দেখায় তাহা নয়, ইহাতে মৃত স্বামীর পারলৌকিক অমঙ্গলও ঘটিয়া থাকে। কাঁদিতে হইলে ঘরের এককোণে বসিয়া নীরবে কাঁদিতে হয়।

রাধারাণী নির্লজ্জতার জন্য কোন চিন্তা করিল না। এই দুঃসময়ে তাহার আবার লজ্জা সরম কি? তাহার মৃত স্বামীর যদি পারলৌকিক কোন অমঙ্গল ঘটে কেবল ইহা ভাবিয়াই সে ঘরের ভিতর যাইয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু নীরব ক্রন্দনে তাহার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের ভার আরো বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, সে আবার চিৎকার করিয়া কাঁদে, কেবল দারুণ দেশাচারের কথা স্মরণ করিয়া সে তাহার দুর্দ্দমনীয় মনের বেগ অতি কষ্টে দমন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার মনে সময় সময় প্রশ্ন উদয় হইতেছিল যে, মৃতের অন্যান্য আত্মীয়বর্গের উচ্চ ক্রন্দনে যদি পারলৌকিক অমঙ্গল না ঘটে, তবে কেবল স্ত্রীর উচ্চ ক্রন্দনেই বা তাহা হইবে কেন? সুতরাং ইহা একটা দেশাচার মাত্র।

সময় পরিবর্ত্তনশীল। সময়ে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ও শান্তিলাভ করে। সময়ের পরিবর্ত্তনে রাধারাণীর শ্বশুরালয়েও কথঞ্চিৎ শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। সেই উচ্চ ক্রন্দনের রোল ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর ধারণ করিল। খাওয়া-পরা,

সুখ-শান্তি যাহার যেমন ছিল, সময়ের পরিবর্ত্তনে মৃতের আত্মীয়গণ ক্রমশঃ তাহার কিছু কিছু ফিরিয়া পাইল। কেবল পাইল না একজন—সে সেই বালবিধবা রাধারাণী।

রাধারাণীর খাওয়া-পরা, সুখ-শান্তি সবই জন্মের মত চলিয়া গিয়াছে। সে এই অল্প বয়সেই শাড়ী ছাড়িয়া সাদা কাপড় পরিতেছে। সেমিজ বডিস ছাড়িয়া অনাবৃত শরীরে এবং কখন কখন বা অঞ্চলাবৃত দেহে থাকিতেছে। সিঁথির সিন্দুর সে চিরকালের জন্য মুছিয়া ফেলিয়াছে। হাতের শঙ্খ ও অন্যান্য অলঙ্কারাদি ত্যাগ করিয়া খালি হাতে রহিয়াছে। তিনবেলা আহারের পরিবর্ত্তে এখন মাত্র একবেলা নিরামিষ আহার করিতেছে।

বৈধব্যের পরে রাধারাণী মনে করিয়াছিল যে, বাকী জীবন সে শ্বশুরালয়েই কাটাইবে। কিন্তু কপাল যাহার মন্দ তাহার কোনস্থানেই দীর্ঘদিনের জন্য ঠাঁই হয় না। শচীনাথের মৃত্যুর তিনমাস পর হইতেই রাধারাণীর উপর তাহার শাশুড়ী ও ননদীর অত্যাচার আরম্ভ হইল। তাহারা পথে-ঘাটে সকলের নিকটই সত্যমিথ্যা কতকগুলি অপবাদ তাহার স্বভাব-চরিত্রের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে লাগিল। খুঁটিনাটি দোষ ধরিয়া বিধবা বধূকে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিল। আর বলিতে লাগিল, "কি কুক্ষণে অলক্ষণীয়া বউটাকে এনেছিলেম। এতো বউ নয়—যেন রাক্ষসী, তাই এত অল্প দিনের মধ্যেই সোণার চাঁদ শচীনাথকে খেয়ে ফেল্লে। এইরূপ রাক্ষসীর

ছায়া স্পর্শও নিরাপদ নয়। এই আপদটাকে দূর কর্‌তে না পারলে সংসার ছারখার হ'য়ে যাবে।"

প্রথম কয়েক মাস রাধারাণী অতি কষ্টে এই সব উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিল; কিন্তু শেষে তাহার পক্ষে শ্বশুরবাড়ী তিষ্ঠিয়া থাকা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তাহার মনের ভিতরে দারুণ শোক, আবার বাহিরে আত্মীয়-স্বজনের নিষ্ঠুর নির্য্যাতন ও দুর্ব্বাক্য। সে আর কত সহ্য করিবে? তবু এই অবস্থায় সে আরো কয়েক মাস শ্বশুরালয়ে কাটাইয়া দিল।

এক একাদশীতে রাধারাণী নির্জ্জলা উপবাস করিতেছিল। যদিও এইরূপ বালবিধবার পক্ষে অনেক অভিভাবক নির্জ্জলা উপবাস ব্যবস্থা করেন না, কিন্তু রাধারাণীর ভাগ্যদোষে তাহার শাশুড়ী তাহার পক্ষে ঐ ব্যবস্থাই করিয়াছিল। সেইদিন রাধারাণীর শরীর এত দুর্ব্বল ও মন এত খারাপ ছিল যে, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে বিছানায় পড়িয়া নিজ অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতেছিল। এমন সময় শাশুড়ী আসিয়া ভ্রূকুটিসহ বলিল, "ওলো পোড়ারমুখো রাক্ষসী বউ, মরে রয়েছিস্ নাকি? এত যে ডাকাডাকি করছি, কিছুই কি কাণে যাচ্ছে না? সন্ধ্যা হ'য়ে এলো, তবুও কি বিছানায় পড়ে থাক্‌বি? ঐ শর-শর্য্যা ছেড়ে কি একবারও এ সংসারের কাজকর্ম্ম দেখতে হবে না? একাদশীর উপবাস তো কত শত বিধবারা ক'রছে, তোর মত তো কেউ এইভাবে বিছানায় ঢলে পড়ে থাকে না। রাত হ'য়ে এলো, এখনো খোকাকে দুধ

খাওয়ান হয় নাই। আমি স্পষ্ট ক'রে বলছি, এ বাড়ীতে এইভাবে বিছানায় পড়ে থাকলে চলবে না। খেটে খেতে হবে। শীগ্‌গির উঠে গিয়ে সংসারের কাজকর্ম্মে হাত দে। নতুবা এইরূপ অলক্ষণা বউকে খেংরা মেরে তাড়িয়ে দিব।"

শাশুড়ী গালাগালি করিয়া সেইরূপ ভ্রূকুটিভরে চলিয়া গেল। রাধারাণীও চক্ষের জল মুছিয়া তাহার ছোট দেবর "খোকা"কে দুধ গরম করিয়া খাওয়াইতে চলিল। সে বুঝিতে পারিল না তাহার কি অপরাধে শাশুড়ী আসিয়া তাহাকে এত নির্য্যাতন করিয়া গেল। সে তো এ পর্য্যন্ত শাশুড়ীর আহ্বান শুনিতে পায় নাই। শুনিলে তখনই সে ছুটিয়া গিয়া খোকাকে দুধ খাওয়াইত। অন্যান্য দিন এই কাজ তো শাশুড়ী নিজেই করিয়া থাকেন অথবা তাহার ননদীকেও করিতে বলেন। খোকার অকল্যাণ হইবে বলিয়া শাশুড়ী কখনো রাধারাণীকে দুধ খাওয়াইবার আদেশ করেন না। যাহা হউক, রাধারাণী খুব অল্প সময়ের মধ্যে শিশু দেবরকে দুধ খাওয়াইয়া শেষে ঘুম পাড়াইয়া রাখিল।

সন্ধ্যার অন্যান্য কাজ সমাধা করিয়া রাধারাণী যখন বিশ্রাম করিবার জন্য তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে যাইতেছিল তখন সে দেখিল অন্য একটা কক্ষে দাঁড়াইয়া তাহার ননদী চুপে চুপে শাশুড়ীর নিকট নানারূপ অঙ্গভঙ্গী-সহকারে কি যেন বলিতেছে। শাশুড়ী ইহা শুনিবামাত্র ক্রোধে অধীরা হইয়া বলিল, "কি সর্ব্বনেশে বউ গো। একাদশীকে দুধ চুরি ক'রে

খাওয়া ? আগে জান্‌লে কখনো খোকাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য ঐ রাক্ষসীকে বল্‌তেম না। কেবল তোর অনুরোধেই বলেছিলেম। হায়! হায়! ঐ অলক্ষণে বউটাই এ সোণার সংসারে অলক্ষ্মী টেনে এনেছে। আমি যাচ্ছি, এখনি ঐ রাক্ষসীটাকে ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছি।”

ইহা বলিয়াই যখন রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে বাহির হইবার উপক্রম করিল, তখন মেয়ে মাতাকে সজোরে থামাইয়া বলিল, “থাম মা, থাম! চুপ কর, লোকের কাণে এ সব কথা গেলে যে জাত যাবে। এর চেয়ে ওকে ওর বাপের বাড়ী দূর ক’রে দাও। আমাদের সংসারটা তো ছারখার ক’রলেই, এখন একবার ওর বাপের সংসারটা ধ্বংস করুক্ গে।”

রাধারাণী এই কথাগুলি স্পষ্টরূপে শুনিয়া আস্তে আস্তে নিজের কক্ষে চলিয়া গেল। তথায় বসিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি কেহ তাহার খবর লইল না। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, যদি কেহ দয়া করিয়া কিছু বিষ আনিয়া তাহাকে দিত, তবে সে সানন্দে তাহা পান করিয়া এই সব অপবাদ হইতে রক্ষা পাইত। সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার ডাগর চোখ দুইটা রক্তবর্ণ করিয়া ফেলিল। সমস্ত দিন ও রাত্রি অনাহারে ও অনিদ্রায় তাহার শরীর এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, প্রভাত হইলেও বাহিরে যাইতে তাহার কষ্টবোধ হইতেছিল। একটুকু বেলা হইলে যখন সে বাহিরে

আসিল, তখন দেখিল তাহাকে পিত্রালয়ে লইয়া যাইবার জন্ম একখানা শিবিকাসহ দুইজন বাহক প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করিতেছে।

ত্রয়োদশ বর্ষীয়া রাধারাণী যখন তাহার বৈধব্য বেশে পিত্রালয়ে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন পিতা ঈশ্বর মণ্ডল বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। রাধারাণীকে দেখিবার জন্য পাড়ার রমণীগণ ঝাঁকে ঝাঁকে আসিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যেও অনেকে রাধারাণীর বৈধব্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অশ্রু-সম্বরণ করিয়া থাকিতে পারিল না। কেহ কেহ ভগবানের অবিচারে দোষারোপ করিতে লাগিল। এইরূপ চতুর্দ্দিকের ক্রন্দনের রোল, বিশেষতঃ পিতার আকুল ক্রন্দন দর্শন করিয়া রাধারাণীরও বুক ফাটিয়া ক্রন্দন বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিলে যদি মৃত স্বামীর পারলৌকিক অমঙ্গল সংঘটন হয়, ইহা মনে করিয়া সে ঘরের ভিতর ছুটিয়া গেল। সমবয়স্কা রমণীদিগের শত অনুরোধেও সে বাহির হইল না। সেইদিন হইতে ঈশ্বর মণ্ডলের মুখচ্ছবিতে যেন একটা বিষাদের কালিমা-রেখা অধিকতররূপে পতিত হইল। পূর্ব্ব হইতে এখন সে অধিকতরভাবে কি জানি চিন্তা করিয়া

দিন কাটাইতে লাগিল। এই বিষণ্ণতার মধ্যেও সে পুত্র হরিদাসের জন্য একটি সুশ্রী পাত্রী অন্বেষণ করিতে ক্রটি করিল না।

এইভাবে ছয়টি মাস কাটিয়া গেল। ঈশ্বর মণ্ডল তাহার সাংসারিক কাজকর্ম্মে যেন দিন দিন ভগ্নোৎসাহ হইয়া উঠিল। সে যখনই তাহার বালবিধবা কন্যার মুখের দিকে চাহিত, তখনই সংসারটা তাহার নিকট যেন শ্মশানের ন্যায় অনুভূত হইতে লাগিল। সে একদিন পুত্র হরিদাসকে সম্মুখে বসাইয়া বলিল, "হরিদাস, অনেকদিন হ'তে আমি বৃন্দাবন যাব ইচ্ছা করেছি; কিন্তু এখনো আমার হাতে একটা অসম্পূর্ণ কাজ রয়েছে। সেই কাজটা সম্পন্ন করিতে পারিলেই প্রফুল্লচিত্তে তীর্থযাত্রা করিতে পারি। সেই কাজ হয়েছে—তোকে বিয়ে করায়ে ঘরে বধূ রেখে যাওয়া। তোর মাতার মৃত্যুর পর হ'তে আমার বাড়ীতে এ পর্য্যন্ত কোন এয়ো রমণীর স্থান হ'ল না। কপালগতিকে রাধারাণীও বৈধব্য বেশে এসে এখানে উপস্থিত হয়েছে। তুই কেন যে বিয়ে কর্‌তে চাচ্ছিস্ না, তার কোন কারণ ভেবে চিন্তেও ঠিক কর্‌তে পার্‌ছি না। সম্প্রতিক একটি ভাল সম্বন্ধ হাতে এসে পড়েছে। ভাগ্যকুলের কুণ্ডু বংশের মেয়ে। মেয়েটি খুব সুন্দরী। আর এইরূপ সম্ভ্রান্ত ও ধনী ঘরের মেয়ে আন্‌তে পারলে আমাদেরও বংশ উজ্জ্বল হতো।"

পুত্র হরিদাস মাথা হেঁট করিয়া উত্তর করিল, "বাবা,

এইমাত্র আমি সতের বৎসর বয়সে পা দিয়েছি। এত অল্প বয়সে বিয়ে করা কি আপনি ভাল মনে করেন? মৃত্যুভয় যখন আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে, তখন এত অল্প বয়সে বিয়ে করে ঘরের মধ্যে একটা বাল-বিধবাকে রক্ষা করা যে কত কষ্টকর হয়ে পড়বে, সেই পরিণাম চিন্তা করা সর্ব্বাগ্রে উচিত। আপনি নিজ চক্ষের উপরেই রাধারাণীর অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন। আরো যে কত দুর্দ্দশা উহার ভাগ্যে রয়েছে তার ঠিক কি? এই সব ভেবে চিন্তে আমি মনে করেছি যে অন্যূন চব্বিশ বৎসর বয়স না হ'লে বিয়ের নামও করব না। আর অন্যূন আঠার বৎসর বয়সের কম কোন রমণীর পাণি গ্রহণ করা হবে না। আমার উদ্দেশ্য এই যে যদি বিবাহের অল্পকাল পরেই আমার মৃত্যু হয়, তবু আমার বিধবা পত্নী আঠার বৎসর পর্য্যন্ত বৈধব্য যন্ত্রণা হ'তে মুক্তি পেতে পারবে।"

পিতা বলিলেন, "এই সব বিষয় তর্ক ক'রে মীমাংসা করা কঠিন। একদিকে যেমন মৃত্যুভয়ের জন্য অল্প বয়সে বিবাহ করতে চাচ্ছ না, অন্য দিকে তেমনি মৃত্যুভয়ের জন্যই পুরুষের পক্ষে ষোড়শ বর্ষেই বিবাহের দরকার। কারণ এই কলিকালে মানুষের পরমায়ুর পরিমাণ বড়ই অল্প। দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা হয়ে থাকে। আমাদের সমাজে বাল্য-বিবাহ বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত রয়েছে। যাঁরা বাল্য-বিবাহ ব্যবস্থা করেছিলেন, তাঁরা অবশ্যই ইহার

মধ্যে কতকগুলি শুভ লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন। মনে কর তোমাকে বিদ্যালয় হ'তে উঠায়ে এনে অতি অল্প বয়সেই ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে প্রবেশ করায়েছি। ইহাতে তুমি ক্রমশঃই একজন পাকা কারবারি হয়ে দাঁড়াতে পেরেছ। সেইরূপ যদি অল্প বয়সের কোন বালিকা বধূ সংসারে প্রবেশ করে, সে ক্রমে বড় হয়ে একটি পাকা গিন্নীতে পরিণত হ'তে সমর্থা হবে। আর বয়স্থা বধূগণ হঠাৎ স্বামীর সংসারে ঢুকে একেবারে চারিদিক অন্ধকার দেখবে। তার পক্ষে পাকা গিন্নী হ'তে ঢের সময়ের দরকার হবে। এইরূপ ভাল ও মন্দ সকল সময়ে ও সকল কাজেই রয়েছে। কিন্তু আমি কেন যে তোমাকে এখন বিয়ে করাতে চাচ্ছি, তার কারণ হয়েছে তোমার মাতার পরিত্যক্ত সংসারটাকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা; নতুবা তুমি যদি আরো সাত বৎসর পরে বিবাহ কর, তাতে আমার কোন আপত্তি ছিল না।"

পুত্র বলিল, "ভালমন্দ যে সব দিকেই আছে তাহা অস্বীকার করবার যো নাই। তবে রাধারাণীর মত বাল-বিধবাদিগের কথা স্মরণ ক'রে ও তাদের পরিণাম চিন্তা ক'রে আমি স্থির করেছি যে শীঘ্র বিয়ে করব না। আমাদের হিন্দু-সমাজে যদি বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকত, তবে আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করতে দ্বিধা জ্ঞান করতেম না। আচ্ছা বাবা, রাধারাণীকে কি আমরা পুনরায় বিয়ে দিতে পারি না?"

পিতা বলিলেন, "আমাদের ইচ্ছা থাকলে কি হবে বাবা? বর তো জুটবে না। জুটলেও যে বিয়ে করবে ও যে বিয়ে দিবে উভয়কেই সমাজচ্যুত হ'তে হবে।"

পুত্র উত্তর করিল, "তবে কি একটা বাল-বিধবা চিরজীবন দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করবে? সেই পাপের ভাগী কি সমাজ হবে না?"

পিতা বলিলেন, "এই প্রশ্নের সুমীমাংসা এখনো কেহ করতে পারেন নাই। তবে এমন দিন আসবে যখন বিধবা-বিবাহ সমাজে আস্তে আস্তে প্রচলিত হবে। তাই বিদ্যাসাগর মহাশয় নাকি এই বিষয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন। যুগধর্ম্মে যে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী তাহা কেহই বন্ধ করিতে পারে না। থাক্ সে সব কথা। আমি একটা ভাল দিন দেখে শীঘ্রই বৃন্দাবন যাত্রা করব। কবে যে ফিরি তার নিশ্চয়তা নাই। তুমি যখন বিয়ে করতে চাচ্ছ না, তখন তোমাকে সেইজন্য পীড়াপীড়ি করব না। তোমার দুটী কাজ করতে হবে। প্রথমতঃ—রাধারাণীর মা নাই। তুমিই উহাকে মার মত স্নেহের চোখে দেখবে। আর উহার যাতে কোন বিষয়ে কষ্ট না হয় তা করবে। দ্বিতীয়তঃ—ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি করতে চেষ্টা করবে। অতি কষ্টে মূলধন সঞ্চয় করে কারবার করছি, সেই মূলধনের যাতে ধ্বংস না হয় সেইদিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখবে।"

ইহা বলিয়াই ঈশ্বর মণ্ডল কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হরিদাস দেখিল, পিতার চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু ঝরিতেছে। পিতার ক্রন্দনে পুত্রের চোখেও জল আসিল।

হরিদাস কাঁদিয়া বলিল, "বাবা, আপনি শুভ কাজে, বিশেষতঃ তীর্থ-দর্শনে যাচ্ছেন, সুতরাং এই সংকল্প হ'তে ক্ষান্ত হবার জন্য বলা আমার পক্ষে পাপের কাজ হবে। তবু বলছি, আরো পাঁচটা বৎসর অপেক্ষা করে যদি যেতেন, তবে আমাদের পক্ষে ভাল হ'ত, কারণ আমি এখনো যে ছেলে-মানুষ।"

পিতা বলিলেন, "তোমার মাতৃ-বিয়োগ হতেই আমার শরীর একপ্রকার ভেঙ্গে গিয়েছে। তারপর রাধারাণীর বৈধব্য। সংসারে থাক্‌লে আরো কত যে শোক-তাপ ভোগ করতে হবে, তার নিশ্চয়তা নাই। বলতে লজ্জা করছে, তোমার মাতৃ-বিয়োগের পরেই আমাকে কেহ কেহ দার-পরিগ্রহ করতে পরামর্শ দিয়েছিল, আমি তাদের অনুরোধ রক্ষা করি নাই। যে সমাজে পুরুষের পক্ষে স্ত্রী-বিয়োগ হ'লে দ্বিতীয়বার স্ত্রী-গ্রহণ করবার প্রথা আছে; অথচ বয়স্কা বিধবা তো দূরে থাক্, বাল-বিধবাদের পর্য্যন্ত দ্বিতীয়বার পতি গ্রহণ করবার ব্যবস্থা নেই, সেই সমাজে আর এক দণ্ডও বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছে না। আমি প্রথমতঃ শ্রীধাম নবদ্বীপে কতক কাল বাস করব। শেষে শ্রীধাম বৃন্দাবন চলে যাব। তোমরা কেহ আমার এই সংকল্প হতে আমাকে নিরস্ত করো না।"

পিতাব এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প দর্শন করিয়া হরিদাস আর বেশী কিছু বলিল না। সে বিষণ্নমনে রাধারাণীর নিকট যাইয়া পিতার সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করিল এবং রাধারাণীকে পিতার নিকট যাইয়া পিতাকে আরো কিছুদিন সংসারে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে বলিল।

বাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার পদপ্রান্তে বসিয়া বলিল, "বাবা, আপনি এখন কোনমতেই বাড়ী ছেড়ে যেতে পারবেন না। আপনি চলে গেলে আমাব দশা কি হবে বাবা ?"

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পিতা, কন্যার এই করুণ প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। কন্যাকে প্রবোধ ও সান্ত্বনা দিয়া এক শুভদিনে তীর্থ উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

৪

ঈশ্বর মণ্ডল গৃহত্যাগ করিয়া তীর্থোদ্দেশে চলিয়া যাওয়ার পরে তিন বৎসব অতীত হইয়াছে। এই তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার বাড়ীতে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই। তাঁহার সংসারের ও দোকানগুলির কাজকর্ম্ম পূর্ব্বের ন্যায় চলিয়া

যাইতেছে। তাঁহার বাড়ীর পরিজনবর্গের খাওয়া-পরা পূর্ব্বে যেমন চলিত এখনো তেমনি ভাবেই চলিতেছে। কোন বিষয়েই বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। পরিবর্ত্তনের মধ্যে হইয়াছে একমাত্র—রাধারাণীর রূপ। তাহার রূপের জ্যোতিঃ এই তিন বৎসরের ভিতর যেন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। সে এখন ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। যৌবনের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ সর্ব্বাঙ্গে ঝল্‌সিয়া পড়িতেছে। রাধারাণীকে সকলেই খুব ভালবাসিত, বিশেষতঃ অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছে বলিয়া গ্রামস্থ কেহই তাহার মাথার দীর্ঘ কেশগুচ্ছ কাটাইয়া ছোট করিবার ব্যবস্থা দিয়াছিল না। চুলগুলি এত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছিল যে স্নানান্তে সে যখন দাঁড়াইয়া তাহার ঘন-কাল-কুন্তলরাশি সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক করিবার জন্য পৃষ্ঠোপরি ছড়াইয়া দিত, তখন সেই কুন্তলগুচ্ছ একেবারে নিতম্ব চুম্বন করিত। তখন তাহাকে স্বর্গচ্যুতা কোন দেববালার মত দেখাইত। সে যখন কলসী কাঁকে করিয়া মাঠস্থ পুকুরে জল আনিতে যাইত, তখন কোন কোন সমবয়স্কা রমণী তাহার এই অসামান্য রূপ দর্শন করিয়া ঈর্ষ্যান্বিতা হইত এবং ভগবানের পক্ষপাতিত্বে দোষারোপ করিত। কেহ কেহ এইরূপ অনিন্দ্য-সুন্দরীকে অকালে বিধবা করিয়াছে বলিয়া ভগবানকে মনে মনে গালি দিত। আবার কোন কোন বিবাহিত যুবক এই দেব-দুর্ল্লভ রূপরাশি দর্শন করিয়া নিজের পরিণীতা পত্নীর রূপকে নিন্দা করিত। আর অবিবাহিত যুবকগণ মনে মনে ভগবানের

নিকট মানস করিত যেন তাহাদের ভাগ্যে এইরূপ সুন্দরী ভার্য্যা অচিরে ঘটে।

রাধারাণী কিন্তু এই সব কিছুই জানিত না। সে আপন মনে মাটীর দিকে মাথা হেঁট করিয়া পুকুরে জল আনিতে যাইত; আবার সেইভাবেই বাড়ীতে ফিরিয়া আসিত। সে কোন দিকেই তাকাইত না। পথিমধ্যে পাড়ার কোন পরিচিত পুরুষ বা রমণী তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিয়া গন্তব্যপথে চলিয়া যাইত।

রাধারাণী এত সতর্কতার সহিত চলিলেও চতুর্দ্দিকে তাহার চরিত্রের বিরুদ্ধে একদল দুষ্ট প্রকৃতির নরনারী কুৎসা রটনা করিতে ছাড়িল না। কেহ বলিল, "মেয়েটার স্বভাব-চরিত্র নিশ্চয় খারাপ, নতুবা নিজেদের পুকুর থাকিতে কেন সে প্রত্যহ জলের জন্য নির্জ্জন মাঠের মধ্যে যাইতে ভালবাসে।"

কেহ কেহ বলিত, "ছুঁড়িটার চরিত্র অবশ্য খারাপ, নতুবা বাড়ীতে ময়লা কাপড় পরিলেও স্নান কর্‌বার জন্য মাঠের পুকুরে যাবার সময় একখানা পরিষ্কার ধপ্‌ধপে সাদা কাপড় পরিয়ে যায় কেন?"

কেহ বলিত, "ঈশ্বর মণ্ডলের মেয়েটার খারাপ ভাবভঙ্গী দেখে ভয় হচ্ছে যে দু' দিন পরে কি-যে ক'রে বসে তার ঠিক নাই। বিধবা হয়েও মাথায় এতগুলি চুল রেখেছে। পাড়ার ছোকরাগুলিকে ঐ চুলের বাহার দেখাবারই ওর উদ্দেশ্য।"

আবার কেহ কেহ বলিত, "ঐ যে ছুঁড়িটা মাথা হেঁট করে চলে যাচ্ছে উহার ভিতরেও ঢের বদমায়েসী রয়েছে। ঐ দেখছ না যেন একটুকু মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসছে, আর আড়নয়নে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।"

এইরূপ অলীক কুৎসা গ্রামের মধ্যে প্রচার হওয়ায় একদল উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি যুবকের প্রলোভন রাধারাণীর দিকে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহারা কি প্রকারে রাধারাণীকে হস্তগত করিতে পারিবে তজ্জন্য মনে মনে ফন্দি আঁটিতে লাগিল। কিন্তু রাধারাণীর সরল মনে এই সব কু-চক্রান্তের বিন্দু-বিসর্গও পৌঁছিল না। সে যেমনিভাবে প্রত্যহ মাঠের পুকুরে যাওয়া-আসা করিত, এখনো তেমনি-ভাবে যাওয়া-আসা করিতে লাগিল। কারণ, নিজেদের বাড়ীর পুকুরের জল অব্যবহার্য্য হইয়াছিল। জলগুলি রক্তিমাকার ধারণ করিয়াছিল, এবং জলে বেঙের পোণা ও নানাপ্রকারেব কীট বাস করিত। এই জল খাওয়া ও রন্ধনের কাজে ব্যতীত অন্যান্য বাজে কাজে ব্যবহৃত হইত।

যাহার ভাগ্যে সুখ নাই, তাহার স্বর্গে গেলেও সুখ হয় না। সুখ-শান্তির আশায় রাধারাণী শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে স্থান লইয়াছিল। আসিবার কয়েক মাস পরেই তাহার স্নেহময় পিতা গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। পাঁচ বৎসর বয়সের সময় মাতৃহারা হইয়া এই পিতার ক্রোড়েই লালিতা ও পালিতা হইয়াছিল। সে কয়েক বৎসর যাবত

স্বামীহারা হইয়া বৈধব্যকে বরণ করিয়া লইয়াছে, আর তাহার জীবনের সুখ-শান্তিও সেই সঙ্গে সঙ্গে জলাঞ্জলি দিয়াছে। আবাব আজ যৌবনে পদার্পণ করা মাত্র তাহাব বিরুদ্ধে কতকগুলি অলীক কুৎসা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে।

এই সব অলীক কুৎসা ধীরে ধীরে রাধাবাণীব কর্ণে পৌছিতে লাগিল। ইহাতে তাহার অশান্ত হৃদয়টাকে অধিকতব অশান্তিতে বিলোড়িত করিয়া তুলিল। সে কখন কখন মনে মনে বলিত. "শুনেছি লোকে ফাঁসী দিয়ে আত্ম-হত্যা করে। সেই ফাঁসী যে কিভাবে দিতে হয় তা যদি জানতেম, তবে সংসারের এই সব নিন্দাবাদ হইতে উদ্ধার পেতে পারতেম। বিষ খেয়েও তো লোক আত্মহত্যা করে. কিন্তু সেই বিষ কোথায় পাওয়া যায় তা তো জানি না।"

রাধারাণী এইরূপ চিন্তা কবিয়া কতক্ষণ সে ভগবানকে ডাকিত। তুলসীতলায় যাইয়া মাথা কুটিত। তবু সে যে কি করিবে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিত না। অবশেষে একদিন কাঁচি দ্বারা নিজেই তাহার সেই তরঙ্গায়িত সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ খুব খাট করিয়া কাটিয়া ফেলিল। পরিষ্কৃত বসনের পরিবর্ত্তে মলিন বসন পরিধান করিতে লাগিল। এইভাবে নানা চিন্তা-ভাবনার মধ্য দিয়া কয়েক মাস কাটিয়া গেল।

একদিন রাধাবাণী যখন স্নানান্তে আর্দ্র বসনে মাঠের পুকুর হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন সে দেখিল পথের মাঝে

কাহার একখানা চিঠি পড়িয়া রহিয়াছে। অন্যের চিঠি বিবেচনা করিয়া সে উহার প্রতি মনোনিবেশ না করিয়াই চলিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু কর্ত্তব্যের তাড়নায় আবার ফিরিয়া আসিয়া পত্রখানা কুড়াইয়া লইল। তাহার মনে হইল, হয় তো অসাবধানতা বশতঃ কেহ ইহা রাস্তায় ফেলিয়া গিয়াছে। যদি পত্রখানা কাহারও দ্বারা ডাকবাক্সে ফেলান যায় তবে একটা পরোপকারের কাজ করা হইবে। হয় তো পত্রখানা খুব দরকারী। এইরূপ পরোপকার করিতে যাইয়া যখন সে শিরোনামার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল, তখন সে অধিকতর বিস্ময়াবিষ্ট হইল। এ যে তাহারই পত্র—পত্রখানা তাহারই উদ্দেশ্যে লিখিত। শিরোনামায় তাহারই নাম ও তাহাদেরই বাড়ীর ঠিকানা রয়েছে। সে ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; অবশেষে কি ভাবিয়া দ্রুত পদবিক্ষেপে বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল।

বাড়ী আসিয়া রাধারাণী প্রথমতঃ তাহার আর্দ্রবস্ত্র ত্যাগ করিল পরে তুলসী বৃক্ষে জল সিঞ্চন করিয়া অন্যান্য নিত্য-নৈমিত্তিক কাজগুলি সম্পন্ন করিল। অবশেষে তাহারই নামীয় পত্রখানা পাঠ করিতে বসিল।

পত্রপাঠ করিয়া ক্রোধে ও লজ্জায় রাধারাণীর রক্তিম গণ্ড আরো রক্তিমাকার ধারণ করিল। পত্রের মধ্যে লেখকের নাম সে খুঁজিয়া পাইল না। কাহার হস্তাক্ষর তাহাও সে বুঝিতে পারিল না। লেখক যেন তাহার কতই পরিচিত,

আত্মীয় ও দরদী। সে রাধারাণীর বৈধব্য দর্শন করিয়া হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইয়াছে। সে রাধারাণীর পরম হিতৈষী ও শুভানুধ্যায়ী। কি করিলে যে সে রাধারাণীর বৈধব্য-কষ্ট দূর করিতে পারিবে তাহা সে নিশিদিন চিন্তা করিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। সে রাধারাণীর সুখ-শান্তির জন্য প্রজ্জ্বলিত অনলকুণ্ডেও ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত আছে।

পত্রপাঠ করিয়া রাধারাণী স্তম্ভিতা হইল। এই দুনিয়াতে যে তাহার এইরূপ একজন শুভানুধ্যায়ী দরদী আছে, ইহা সে শত চিন্তা করিয়াও খুঁজিয়া পাইল না। সে অবশেষে সিদ্ধান্ত করিল যে নিশ্চয়ই ইহা কোন কামাতুর দুষ্ট লোকের চক্রান্ত। তাহার বৈধব্যের পর হইতে কত নরনারী তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রকাশ্যভাবে কতদিন কত সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছে ও তাহার হৃদয়ে শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা করিয়া গিয়াছে। কিন্তু এইভাবে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া নাম ও ঠিকানা বিহীন পত্র দ্বারা সমবেদনা প্রকাশ করা কোন দুষ্ট লোকেব কাজ ছাড়া আর কি হইতে পারে। ইহা নিশ্চয়ই কোন ভ্রষ্ট-চরিত্র লোকের ব্যর্থ চেষ্টা। এইরূপ চক্রান্তের মধ্যে যে দুরভিসন্ধি নিহিত রহিয়াছে তাহার কোন ভুল নাই।

ইহা ভাবিয়া সে পত্রখানা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। পরে উহা আগুনে পোড়াইয়া ভস্মীভূত করিল।

পথের ঘটনা বাড়ীর কাহারও নিকট প্রকাশ করা সে যুক্তি-সঙ্গত মনে করিল না।

৫

এইভাবে দুইমাস কাটিয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে রাধারাণী পুকুর হইতে জল আনিতে যাইয়া আর কোন পত্র পথের মাঝে পড়িয়া থাকিতে দেখে নাই। পূর্ব্বপত্রের কথা সে ক্রমশঃ ভুলিয়া যাইতেছিল। বৃদ্ধ পিসি-মা বিশেষ ঠেকা না হইলে বাড়ীর বাহিরে বা পাড়ার অন্য কোন বাড়ীতে যাওয়া-আসা করে না। সে বাড়ীতে বসিয়াই সংসারের খুঁটিনাটি কাজগুলি সম্পন্ন করিয়া থাকে। হরিদাস প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া দোকানগুলির তত্ত্বাবধান করিতে চলিয়া যায়। কোনদিন মধ্যাহ্নাহার করিবার জন্য বাড়ী আসে, আবার কোনদিন আসেও না। কিন্তু শত হইলেও সে রাত্রিতে অন্যত্র থাকে না। দোকানে কাজকর্ম্মের অত্যন্ত ভিড় থাকিলে এবং তজ্জন্য অধিক রাত্রি হইলেও সে একাকী লণ্ঠন ও লাঠি হস্তে করিয়া বাড়ীতে আসিত।

তাহার প্রধান কারণ বাড়ীতে যুবতী বিধবা ভগ্নী অসহায়াবস্থায় রহিয়াছে। সকল আপদ-বিপদ হইতে তাহাকে রক্ষা করা তাহার অন্যতম কর্ত্তব্য কাজ। বাড়ীর বৃদ্ধ ভৃত্যটি হাট-বাজার ও অন্যান্য ফুট-ফরমায়েসী কাজ করিত।

অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও রাধারাণী মাঠের পুকুরে স্নান করিয়া জলপূর্ণ কলসীসহ বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পূর্ব্ববারের ন্যায় আজও তাহারই নামের একখানা পত্র ঠিক আগেকার মত জায়গায় পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া সে এবারো অনুসন্ধিৎসু হৃদয়ে উহা কুড়াইয়া লইল। পত্র কুড়াইতে কেহ দেখিল কিনা জানিবার জন্য ক্ষণকাল সে চতুর্দ্দিকে তাকাইল। সে দেখিতে পাইল, কিছুদূরে এক বৃক্ষতলে তাহাদের গ্রামের যদু নামক এক ব্রাহ্মণ যুবক অনিমিষ নয়নে তাহারই পানে চাহিয়া রহিয়াছে। যদুর স্বভাব-চরিত্র যে ভাল নয় তাহা সে আগেই জানিত। তাই তাহার মনে হইল, এই উচ্ছৃঙ্খল যদুই এইভাবে পত্রখানা রাধারাণীর গন্তব্যপথে ফেলিয়া রাখিয়াছে। তবে পূর্ব্বপত্রও এই যদুরই কাণ্ড। ইহা ভাবিয়া ঘৃণাভরে যদুকে দেখাইয়া সেই পথের মাঝে পত্রখানা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে বলিয়া মনস্থ করিল। এইসময় সে দেখিল, একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক জল লইবার জন্য কলসী কাঁকে সেই পথ দিয়া আসিতেছে। পাছে যদি সে এইরূপ পত্র ছিন্ন করার কারণ জিজ্ঞাসা করে এবং তাহার উত্তরে কি বলিতে কি বলিয়া

ফেলে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি পত্রখানা লুকাইয়া লইয়া বাড়ী অভিমুখে চলিয়া গেল। ভাবিল, যদি পত্র ছিঁড়িতে হয় তবে বাড়ী যাইয়াই ছিঁড়িবে অথবা পূর্ব্ব পত্রের ন্যায় উহা অগ্নিতে ভস্মীভূত করিবে।

রাধারাণী বাড়ীতে আসিয়া অবসরমত পত্রখানা পাঠ করিয়া দেখিল এই পত্রও তাহারই উদ্দেশে লিখিত। শিরোনামায় তাহারই নাম। হস্তাক্ষর যেন পূর্ব্বপত্রের ন্যায়। কিন্তু ইহাতেও লেখকের নাম-ধাম নাই। এবারকার পত্র-খানা কিছু দীর্ঘ। উহাতে ভালবাসা ও প্রেমের কথা ছাড়া অর্থের প্রলোভনও কিছু রহিয়াছে।

লেখক এবারও জানাইয়াছে যে সে রাধারাণীকে প্রাণাপেক্ষা অধিকতর ভালবাসে। ভগবানের নিকট সে দিনরাত রাধারাণীর মঙ্গল প্রার্থনা করে। তদ্‌বিনিময়ে সে রাধারাণীর ভালবাসা দাবী করে। সে দেখিতে চাহে রাধারাণীর ঐ বিষাদ-মাখা মলিন মুখে একটুকু হাসির রেখা। সে চাহে রাধারাণীর হাসিমাখা মুখের একটুকু প্রেম-সম্ভাষণ। সে চাহে রাধারাণীর ঐ ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর প্রেম-স্পর্শ। রাধারাণী যদি পত্র-লেখকের কথায় স্বীকৃতা হয়, তবে সে রাধারাণীকে এমন এক সুন্দর স্থানে অতি সুখে রাখিবে, যেখানে দুঃখকষ্ট বা বৈধব্যের কঠোর শাসন নাই। আছে সেখানে কেবল স্বর্গের সুখ-সম্ভার, প্রেমের মাখামাখি, আর চির-বসন্তের সুখ-স্পর্শ। এইজন্য সে সহস্র অর্থব্যয় করিতে

প্রস্তুত আছে। রাধারাণীর সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করাই তাহার হৃদয়ের কামনা। এই কামনা রাধারাণীকে পূরণ করিতেই হইবে; নতুবা ইহার পরিণাম ফল বিষময় হইয়া উঠিবে। কারণ এইরূপ নিরাশ হৃদয় লইয়া সে একদণ্ডও পৃথিবীতে বাস করিতে পারিবে না। সে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিবে। কিন্তু আত্মহত্যার পূর্ব্বে এইরূপ উপেক্ষা, অবহেলা ও নৈরাশ্যের প্রতিশোধ সে গ্রহণ করিবেই করিবে। উহা আর কিছু নয়—উহাই ভীষণ প্রতিহিংসা। উহা রাধারাণীর নির্ম্মম বক্ষোপরি লেখকের শাণিত ছুরিকার তীক্ষ্ণ আলিঙ্গন !!

পত্র পাঠ করিয়া ঘৃণায় ও ক্রোধে রাধারাণীর সর্ব্বশরীর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে কম্পিত হস্তে পত্রখানা ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া উহা পদদলিত করিতে লাগিল। সে বুঝিল উহা নিশ্চয়ই ঐ শয়তান যদুর কাজ।

যদু রাধারাণীদের পুরোহিতের ছেলে। বাল্যকালে সে রাধারাণীর সঙ্গে একত্রে পুতুল নিয়া সরল ভাবে খেলা করিয়াছে। রাধারাণী দেখিল যৌবনে সেই যদুরই এত অধঃপতন। গরীব পুরোহিতের ছেলের আবার অর্থের প্রলোভন? কি দুর্ব্বুদ্ধি! এযে পৈশাচিক ও অসম্ভব প্রস্তাব। এযে উচ্ছৃঙ্খল যুবকের নারকীয় কীর্ত্তি। যে যুবক কৃত্রিম ভালবাসা জানাইয়া, আবার হত্যারও ভয় দেখাইয়া একজন রমণীকে বশে আনিতে চেষ্টা করে সে শুধু নির্ব্বোধ নয়—সে নরাধম—নররূপে পশু। কি আশ্চর্য্য!

নরাধম ভয় দেখাইয়া লিখিয়াছে যদি তাহাকে নিরাশ করা হয়, যদি তাহার অযাচিত প্রেম প্রত্যাখ্যান করা হয় তবে সে আগে রাধারাণীকে হত্যা করিয়া শেষে নিজে আত্মহত্যা করিবে। এইরূপ পাষণ্ডের আত্মহত্যাই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। আর রাধারাণীর মৃত্যু? সেতো মরিতেই বসিয়াছে। বৈধব্য দশাতে বাঁচিয়া থাকা আর মৃত্যুকে বরণ করা একই কথা। যাহার সুখ শান্তি চিরকালের জন্য সংসার হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে সেই বিধবার আশু মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়। তিলে তিলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা অপেক্ষা আততায়ীর ছুরিকা বিদ্ধ হইয়া নিমিষে প্রাণত্যাগ করা শতগুণে শ্রেয়ঃ। তাই রাধারাণী মৃত্যুকে কখনো ভয় করে না। সে প্রতি মূহুর্ত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে।

রাধারাণী সংকল্প করিল যে প্রকারেই হউক সে পাষণ্ড যদুকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবে। কৃত্রিম প্রলোভন দেখাইয়া উহাকে সম্মুখে আনিয়া নিজ হস্তে উহার বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিবে। শেষে তাহার ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই হইবে। এমন কি তজ্জন্য যদি ফাঁসীকাষ্ঠেও ঝুলিতে হয় তাহাও সে করিবে।

কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে অন্য চিন্তার উদ্রেক হইল। সে ভাবিল ভালমত না জানিয়া শুনিয়া কেন সে একজন ব্রাহ্মণের জীবন নষ্ট করিবে? হয়তো অন্য কোন দুষ্ট লোক তাহাকে এইভাবে পত্র লিখিতেছে। যদু বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া

তাহার দিকে তাকাইয়াছিল বলিয়াই যে সে এই পত্রদ্বয়ের লেখক ইহা একেবারে সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করাও তো উচিত নয়। যদুর হস্তাক্ষরও তো সে চিনে না। প্রকৃত কু-প্রস্তাবকারী কে অগ্রে জানিতে হইবে শেষে তাহার শাস্তির বিধান করিতে হইবে। অকারণে একজন ব্রাহ্মণ কুমারকে দোষী সাব্যস্ত করাও পাপের কাজ। অকারণে অন্যকে অপরাধী জ্ঞান করিলে নিজেও অপরাধী হইতে হয়।

এইরূপ ভাল মন্দ দুই দিকই চিন্তা করিয়া রাধারাণী স্থির করিল যে তাহার দাদা হরিদাস বাড়ী আসিলে পত্রখানা তাঁহার হাতে দিয়া পূর্ব্ব ও পরের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিবে। তাহার দাদা যে ব্যবস্থা করেন তাহাই করা যাইবে। অতঃপর সে তাহার পদদলিত পত্রখানা কুড়াইয়া লইয়া যত্ন করিয়া রাখিল। এই বিষয় সে তাহার বৃদ্ধ পিসীমাকে জানাইল না। কারণ সে জানিত একবার এই বৃদ্ধার কর্ণে এইরূপ কুৎসিত প্রস্তাবপূর্ণ পত্রগুলির কথা প্রবেশ করিলে সে যদুর চোদ্দ পুরুষ উচ্চারণ করিয়া এমনিভাবে গালাগালি করিতে আরম্ভ করিবে যে শেষে উহা কলহে পরিণত হইয়া কোন এক গুরুতর ঘটনা ঘটাইবে। তাই রাধারাণী তাহার ভ্রাতার প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

৬

সেইদিন হরিদাস অধিক রাত্রিতে বাড়ী আসিয়াছিল বলিয়া রাধারাণী চিঠি দুইখানার কথা দাদার নিকট বলিবার সুবিধা পাইল না। পরদিবস প্রাতে সে দাদার নিকট সব ঘটনা প্রকাশ করিবে মনস্থ করিল। কিন্তু সেই দিনও মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে এই বিষয় সে তাহার দাদার কাণে তুলিতে পারিল না। কারণ, সেইদিন তাঁহাদের গোঁসাই প্রভু শিষ্য বাড়ী উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার দাদা প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত গোঁসাই প্রভুর সেবা ও আহারাদির ব্যবস্থার কাজে বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত ছিল। এইজন্য হরিদাস সেইদিন তাহার দোকানগুলির তত্ত্বাবধান করিতেও যাইতে পারে নাই।

মধ্যাহ্নে যখন গোঁসাই প্রভুর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া হরিদাস তাহার বিছানার এক প্রান্তে বিশ্রাম করিতেছিল, তখন রাধারাণী ম্লানমুখে তাহার নিকট উপস্থিত হইল। এবং পুকুর-পথে প্রাপ্ত পত্রখানা কম্পিত হস্তে দাদার নিকট দিয়া আনুপূর্ব্বিক সকল কথা ধীরে ধীরে প্রকাশ করিল। প্রথম পত্রখানা যে সে আগুন দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে একথাও সে তাহাকে জানাইল। যদু ঠাকুরেরই যে এই পৈশাচিক কাণ্ড ইহা বলিতে যাইয়া তাহার পক্ষেও বলিল যে পত্রে যখন কাহারো স্বাক্ষর নাই এবং যদু ঠাকুরের হস্তাক্ষর তাহাদের

পরিচিত নয়, তখন যতুকে দোষী স্থির করিবার পূর্ব্বে গোপন অনুসন্ধান করাই উচিত।

হরিদাস সব ঘটনাগুলি শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল হতভম্বের ন্যায় বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। ক্রোধে তাহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তিমাকার ধারণ করিল। সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল এখনি সে পত্রখানাসহ যতুর পিতার নিকট উপস্থিত হইবে। তিনি যদি ইহার কোন প্রতিকার না করেন, তবে যতুর উপযুক্ত শাস্তির বিধান সে নিজেই করিবে। আবার সকল বিষয় চিন্তা করিয়া সে স্থির করিল যখন তাহার গোঁসাই প্রভু আজ দয়া করিয়া স্বয়ং তাহার ভবনে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই সুপরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। দিবা-নিদ্রার পরে গোঁসাই প্রভু যখন তাহাকে ডাকিবেন সেই সময় পত্রদ্বয়ের কথা তাঁহাকে জানাইবেন বলিয়া হরিদাস রাধারাণীকে বিদায় করিল। রাধারাণী একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া নিজ কাজে চলিয়া গেল।

গোঁসাই প্রভুর বাড়ী করপাশা গ্রামে। নবশাখা সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার শত শত ধনাঢ্য শিষ্য ও শিষ্যা রহিয়াছে। তন্মধ্যে শিষ্যার সংখ্যাই অধিক। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ শিষ্যের সংখ্যা খুব অল্প।

গোঁসাই প্রভুর শরীরের রঙ্ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। দেহ হৃষ্ট-পুষ্ট। চেহারা সুশ্রী। বয়স ত্রিশের কিছু উপর হইলেও মুখমণ্ডলে গোঁফ-দাড়ির কোন চিহ্ন ছিল না। তিনি এইরূপ

"মাকন্দ" হইলেও কেহ যাত্রাকালীন তাঁহাকে দর্শন করিয়া "অযাত্রা" জ্ঞান করিত না। গোঁসাই প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কতিপয় শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই সময় সময় শিষ্য ও শিষ্যাদিগের নিকট কতক শুদ্ধ ও কতক অশুদ্ধ ব্যাখ্যা করিয়া ভাবাবেশে অশ্রুত্যাগ করিতেন। শ্লোকগুলির অর্থ সম্যকরূপে না বুঝিয়া, কেবল গোঁসাই প্রভুর চক্ষের জল দর্শন করিয়াই অনেক শিষ্য ও শিষ্যা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুবর্ষণ করিত। এইভাবে শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে গোঁসাই প্রভুর প্রতিপত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

প্রায় তিন বৎসর পরে গোঁসাই প্রভু যখন এই শিষ্যালয়ে আসিয়া ষোড়শী রাধারাণীর সুন্দর মুখখানা দর্শন করিলেন, তখনই সেই রূপের ঢেউ আসিয়া তাঁহার প্রাণের ভিতর ঘাতপ্রতিঘাত করিতে লাগিল। আর সেই বৃন্দাবনের গোপিনীদিগের প্রেমময়ী মোহিনী মূর্ত্তির একটা ক্ষীণ আভাষ তাহার মানসচক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিল। গোপিনীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ও অন্যান্য ক্রীড়া-কৌতুক তাঁহার চক্ষের উপর যেন ভাসিতে লাগিল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আহা! বিনা শিক্ষা-দীক্ষায় বনের ফুলটির মত এই কুসুমসদৃশ সুন্দরী নারী এই নির্জ্জন পুরীতে অতি অযত্নে শুকাইতেছে। এই রমণী যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাস্বাদ এক বিন্দুও প্রাপ্ত হইত তবে ইহার দেহ গঙ্গাজলের ন্যায়

পবিত্র হইয়া যাইত; এই বৈধব্য-বিক্ষোভিত বক্ষে অপার আনন্দ উপভোগ করিত এবং বৈকুণ্ঠের পথ ইহার পক্ষে সহজ ও সুগম হইয়া পড়িত। তাই তিনি মনে মনে ভাবিলেন, এই শিষ্যালয়ে কয়েক দিন বাস করিয়া প্রত্যহ নির্জ্জন সন্ধ্যায় রাধারাণীকে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ-লীলার মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়া তাহার পবিত্র প্রেমরস এই বাল-বিধবার হৃদয়ে প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিবেন। তাহার পর প্রকৃত দীক্ষাদান করিয়া শিষ্য ও শিষ্যামণ্ডলীর মধ্যে উহাকে উচ্চাসন প্রদান করিবেন।

দিবানিদ্রার পরে গোঁসাই প্রভু পালঙ্কোপরি উপবেশন করিয়া সন্ধ্যার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আর ভাবিতেছিলেন, রাধারাণীর রূপের কথা। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এইরূপ দেবদুর্ল্লভ মূর্ত্তি দ্বিপাড়ার মত একটা অরক্ষিত স্থানে ফেলিয়া রাখা উচিত নয়। ভগবান যাহাকে এত সৌন্দর্য্য দিয়ে গড়িয়া এই বিশ্বমাঝে পাঠাইয়াছেন তাহাকে দুঃখ-কষ্ট বরণ করিতে না দিয়া চির আনন্দের মধ্যে স্থান দেওয়াই উচিত। তিনি যখন এইভাবে চিন্তা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার দুই চক্ষের কোণে সমবেদনাসূচক দুই বিন্দু অশ্রুকণাও দেখা গেল। এমন সময় হরিদাস তাঁহার নিকট পত্রহস্তে উপস্থিত হইয়া প্রভুর ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। হরিদাস ভাবিল প্রভু হয় তো ভগবানের নাম করিতে করিতে ভাবাবেশে কাঁদিয়া ফেলিয়াছেন।

গোঁসাই প্রভু হস্ত দ্বারা চক্ষু মার্জ্জনা করিতে করিতে বলিলেন, "শোন হরিদাস, আমি দিবানিদ্রায় একটা কষ্টকর স্বপ্ন দেখেছি। ভগবান গোবিন্দজী যেন আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বলছেন, 'ওরে পাষণ্ড গুরু হয়ে তুই কি করছিস? এই যে তোর সম্মুখে বিষণ্ণা বাল-বিধবা রাধারাণী রয়েছে; উহার দুঃখ-কষ্ট দূর করতে চেষ্টা কর। পূর্ব্বজন্মে সে আমার প্রিয় গোপিকাগণের মধ্যে অন্যতম সহচরী ছিল।"

গোঁসাই প্রভু আরো বলিতে লাগিলেন, "দেখ হরিদাস, এই বাল-বিধবা রাধারাণীর কথা আমার বিস্মরণ হয়ে গিয়েছিল। ভগবান গোবিন্দজীর করুণায় উহার কথা এখন আমার স্মৃতিপথে উদয় হয়েছে। তিনি যখন আদেশ করেছেন, তখন আমাকে এই বালবিধবার দুঃখ-কষ্ট যে প্রকারেই হউক দূর করে উহার ঐ দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি স্থাপন করতেই হবে। শান্তি স্থাপন করতে হলেই দীক্ষা প্রদান করা বিশেষ দরকার। সেই কৃষ্ণমন্ত্র জপ করতে করতে উহার সব দুঃখ-কষ্ট কেটে যাবে। নতুবা অন্য উপায় আর নাই। রাধারাণীর দুঃখ-কষ্টের কথা স্মরণ করেই আমি কাঁদতে-ছিলাম। আমি ছাড়া উহার তো ত্রাণকর্ত্তা আর কেউ নাই। গুরুই ধর্ম্ম—গুরুই কর্ম্ম—গুরুই সব। রাধে গোবিন্দ! রাধে গোবিন্দ!" ইহা বলিয়া গোঁসাই প্রভু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

হরিদাস, গোঁসাই প্রভুর সহানুভূতিসূচক বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া রাধারাণীর প্রদত্ত পত্রখানা তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। আর আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিল, "আপনিই এখন আমাদের মুরব্বী, রক্ষাকর্ত্তা ও পরামর্শদাতা। পিতা মহাশয় এখানে উপস্থিত নাই যে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করবো। এই অবস্থায় আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করিয়া আমাকে করিবার জন্য আদেশ প্রদান করবেন, তাহাই করবো।"

গোঁসাই প্রভু পত্রখানা আর পাঠ করিলেন না। শিষ্যের সকল কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল চক্ষু মুদ্রিতাবস্থায় আত্মস্থ হইয়া রহিলেন। শিষ্য দেখিল গুরু ধ্যানস্থ হইয়াছেন। শিষ্যের হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইল।

চক্ষুরুন্মীলন করিয়া গোঁসাই প্রভু ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "হরিদাস! অন্যান্য শিষ্যগণ হ'তে তোমরা আমার অধিকতর প্রিয়। তোমাদের সুখ, দুঃখ, মান, অপমান সবই আমার দেখা উচিত। তোমাদের মানে আমার মান; তোমাদের অপমানে আমার অপমান। যে রকম সময় পড়িয়াছে তাতে আজকাল যুবতী, বিশেষতঃ রাধারাণীর মত অল্পবয়স্কা বিধবা স্ত্রীলোক নিয়া গৃহে বাস করা বড়ই দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। সেই সত্য যুগ যে আর নাই হরিদাস! এখন ঘোর কলিকাল উপস্থিত। তুমি যে এইরূপ বদমাসের প্রতীকার করার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ না করে গুরুর শরণাপন্ন হয়েছ, তজ্জন্য তোমার সুবুদ্ধিরই পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছি। তজ্জন্য

তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি। রাধারাণী শুধু আমার শিষ্যের কন্যা নয়, আমি তাহাকে নিজ কন্যার ন্যায় জ্ঞান করি। এই বাল-বিধবার এইরূপ পত্র দ্বারা অপমানে আমাকেও আমি অপমানিত জ্ঞান করছি। তোমার পিতা গৃহত্যাগী, তুমিও নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে সমস্তদিন অন্যত্র বাস কর। তোমার বৃদ্ধা পিসীমাও সকল বিষয় তত্ত্বাবধান করিতে অসমর্থা। কাজে কাজেই তোমার বাড়ী অরক্ষিত। রাধারাণী সুন্দরী যুবতী। এই অবস্থায় উচ্ছৃঙ্খল যুবকদিগের কুদৃষ্টি উহার উপর পতিত হওয়া অনিবার্য্য। সুতরাং রাধারাণীকে কোন এক সুরক্ষিত স্থানে স্থানান্তরিত করা এখনই দরকার। কখন যে অশুভ ঘটনা ঘ'টে উঠে, তার তো নিশ্চয় নাই।"

হরিদাস, গুরুর মন্তব্য শ্রবণ করিয়া বলিল, "তবে কি রাধারাণীকে পুনরায় তাহার শ্বশ্রূর নিকট পাঠান উচিত মনে করেন ?"

গোঁসাই প্রভু গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "এই নিরীহ বালিকাকে পুনরায় তাহার শ্বশ্রূর নিকট পাঠানও যে কথা, উহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলাও সেই কথা। এই কয় বৎসরের মধ্যেই কি উহার শ্বশুরালয়ের কুব্যবহারের কথা ভুলে গেলে ? যদি রাধারাণী আরো দু' মাস সেখানে বাস করতো, তবে উহাকে আবার দেখতে পেতে কিনা সন্দেহ। আহা ! বালিকা বধূর উপর কি জঘন্য অত্যাচারই করা হয়েছিল। এইরূপ হৃদয়হীন পিশাচ শাশুড়ীর নামও করতে নাই।"

হরিদাস নিরাশভাবে উত্তর করিল, "রাধিকে স্থানান্তরিত করা যে একান্ত দরকার তা বুঝলেম। কোথায় যে পাঠাব তা ভেবে চিন্তে ঠিক পাচ্ছি না। আমার মাতুলালয় যে ঢাকা সহরে তা আপনি জ্ঞাত আছেন। রাধিকে কতক কাল সেখানে রাখলে কি হয় না! গত বৎসর মাতুল মারা গিয়াছেন। এখন সেখানে মাতুলানী ও এক মাতুল ভাই ছাড়া আর কেহ নাই। মাতুল ভাইটির বয়স খুব অল্প। সে স্কুলে পড়ছে।"

গোঁসাই প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করিলেন, "তুমি দেখছি একটা সামান্য বিষয় বুঝতে পারলে না, হরিদাস! আর বুঝবেই বা কি করে? তুমি ছেলেমানুষ বৈতো নও। আমি তোমাকে ভাল করে বুঝাচ্ছি, শোন। একে রাধারাণী বিধবা, তাতে আবার যুবতী। মাতুলটিরও মৃত্যু হয়েছে। মাতুল ভাইটিও একেবারে ছেলেমানুষ। আবার ঢাকার মত একটা প্রকাণ্ড সহর যেখানে শত শত গুণ্ডা রাতদিন গুণ্ডামি করে খাচ্ছে। এই সব বিবেচনা করে তোমার যা ইচ্ছা হয় কর-গে। আমার পরামর্শ গ্রহণ করার কোন দরকারই নাই।"

গোঁসাই প্রভুর ক্রোধ দর্শন করিয়া হরিদাস ভীতিবিহ্বল চিত্তে বলিল, "প্রভু, আমি ছেলেমানুষ। এই সব বিষয় বুঝতে না পেরেই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। দয়া করে যা আদেশ করবেন তাই পালন করবো।"

এবার গোঁসাই প্রভু একটুকু মৃদু হাসির সহিত বলিলেন, "হরিদাস, আমি যখন জীবিত রয়েছি, তখন তোমাদের কোন ভয়ের কারণ নাই। রাধারাণীকে রক্ষা করবার ভার আমিই গ্রহণ করলেম—ইহাই ভগবান গোবিন্দজীর আদেশ। তোমাদের রক্ষার ভার গ্রহণ না ক'রে তো উপায় নেই। গুরুর কর্ত্তব্য শিষ্যকে রক্ষা করা—ইহা শাস্ত্রের কথা। মনে করেছিলেম তোমাদের এখানে আরো কয়েকটা দিন থাকবো, কিন্তু চতুর্দ্দিকে যেরূপ ষড়যন্ত্র দেখতে পাচ্ছি, তাতে রাধারাণীকে স্থানান্তরিত করা সর্ব্বাগ্রে দরকার। তাই আর কালবিলম্ব না করে, আগামী কল্যই রাধারাণীকে সঙ্গে করে করপাশা রওনা হব। সেই সুরক্ষিত স্থানে রাধারাণী কন্যার ন্যায় লালিতাপালিতা হবে। আমার বাড়ী তো দেখেছই—চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা। যমও ঐ পুরীতে প্রবেশ করতে সাহস পায় না। বিশেষতঃ সেখানে ভগবান গোবিন্দজী বিগ্রহরূপে স্বয়ং অধিষ্ঠিত রয়েছেন। তিনি যে জাগ্রত ও প্রত্যক্ষ দেবতা। গোবিন্দজীর দয়ায় সেখানে এই বালবিধবার সদ্‌গতির একটা পন্থা হবে। সে যে বড়ই শান্তির স্থান। বুঝলে তো হরিদাস?"

হরিদাস এবার নিশ্চিন্ত হইয়া উত্তর করিল, "হাঁ প্রভু বুঝেছি। গুরুপাটে বাস ক'রে প্রত্যহ গুরুর প্রসাদ পাওয়া বড়ই ভাগ্যের কথা। রাধারাণীর ভাগ্য ভাল বলেই আপনি স্বয়ং এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। রাধারাণীও

এই কথা শুনলে যথেষ্ট আনন্দিতা হবে। আমিও মাঝে মাঝে সেই পুণ্য ভূমিতে গিয়ে রাধারাণীকে দেখে আসবো।"

হরিদাসের সম্মতিতে গোঁসাই প্রভু যারপর নাই সন্তোষ লাভ করিয়া হরিদাসকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহার পরদিনই তিনি হৃষ্টমনে রাধারাণীকে সঙ্গে করিয়া নিজালয়ে চলিয়া গেলেন।

বাড়ীতে পৌঁছিয়াই গোঁসাই প্রভু তাড়াতাড়ি রাধারাণীকে ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষা দান করিলেন। পঞ্জিকা দেখিয়া একটা ভাল দিনেরও অপেক্ষা করিলেন না। প্রত্যহ রাধারাণীকে নির্জ্জনে বসাইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা-মাধুরী শ্রবণ করাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে রাধারাণী গুরুবাড়ীর অন্যান্য শিষ্য ও শিষ্যাগণ হইতে গোঁসাই প্রভুর অধিকতর আদর ও যত্নলাভ করিতে লাগিল। রাধারাণীর বৈধব্য-দগ্ধ হৃদয়ে তাহার অগোচরে দিন দিন একটা শান্তির ছায়া আসিয়া যেন স্পর্শ করিতে লাগিল।

৭

দুই বৎসর যাবত রাধারাণী গোঁসাই বাড়ীতে বাস করিতেছে। এই সময়ের মধ্যে হরিদাস কয়েকবার গুরুপাটে আসিয়া রাধারাণীকে দেখিয়া গিয়াছে। এবারও সে ভগ্নীকে দেখিবার জন্য গুরুপাটে আসিয়া তিন রাত্রি বাস করিবে মনস্থ করিয়াছে। সে জানে গুরুপাট তীর্থক্ষেত্র। এখানে আসিলেই ত্রিরাত্রি বাস করিতে হয়, নতুবা পুণ্য সঞ্চয় হয় না! আজকার রাত্রিখানা কাটাইলেই তিন রাত্রি পূর্ণ হইবে।

বৈকাল বেলায় গোঁসাই প্রভু আরো দুইজন শিষ্য সমভিব্যাহারে বৈঠকখানায় আসিয়া ম্লানমুখে শিষ্য হরিদাসকে বলিলেন, "হরিদাস, বোধ হয় তুমি জান না যে ভগবান গোবিন্দজী আজ মধ্যাহ্নের পর হতেই অনাহারে রয়েছেন। আজকার "বৈকালীর" ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করা যাচ্ছে না। এই কষ্টে আমি অস্থির হয়ে পড়েছি। আহা! এখন হতেই গোবিন্দজীর মুখের দিকে তাকান কঠিন হয়ে পড়েছে। কখন যে তিনি একটা অভিসম্পাত করে বসেন তার ঠিক নাই। ইহার প্রতীকার শীঘ্র করতে হবে বলেই তোমার নিকট এসেছি।" এক নিশ্বাসে এই কথাগুলি বলিয়া গোঁসাই প্রভু উত্তরের অপেক্ষায় শিষ্যের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

যদিও গোবিন্দজীর অশুচি ও উপবাসের কথা হরিদাসের নিকট গোপন ছিল না, তত্রাচ সে যেন কিছুই জানে না এইরূপ ভাণ করিয়া গোঁসাই প্রভুর চরণ ধুলি গ্রহণ করিতে করিতে বলিল, "গোবিন্দজী অভুক্ত রয়েছেন এতো বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। পূজারি ঠাকুর বুঝি আজ পূজা করতে এখনো আসেন নাই?"

গোঁসাই প্রভু মুখখানা আরো একটুকু ভার করিয়া উত্তর করিলেন, "তা নয় হরিদাস, তুমি আজ ঘোরতর অপরাধ করেছ। গোবিন্দজী তজ্জন্য অশুচি হয়ে পড়েছেন। দেবতা, ব্রাহ্মণগণ অশুচি অবস্থায় জলটুকুও গ্রহণ করেন না। তাই গোবিন্দজীকে পুনরায় অভিষেক করায়ে শুচি করাতে হবে।"

হরিদাস আরো আশ্চর্য্যের ভাণ করিয়া বলিল, "আমি যে কোন অপরাধ করেছি এমত তো স্মরণ হচ্ছে না। আর অপরাধ করলেম আমি, তাতে আমি অশুচি হলেম না, অশুচি হলেন গোবিন্দজী। ইহার অর্থ তো বুঝতে পারলেম না, প্রভু।

গোঁসাই প্রভু বলিলেন, "কথাটা হয়েছে খুব সহজ। তোমাকে সবটা ভেঙ্গে বল্লেই বুঝতে পারবে। তুমি অব্রাহ্মণ— তাই তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অশুচি। ইহা আমার ব্যবস্থা নয়— শাস্ত্রকার ঋষিদিগের ব্যবস্থা। অশুচি অবস্থায় ঠাকুরঘরে প্রবেশ করলে, অথবা ঠাকুরকে স্পর্শ করলে ঠাকুরও অশুচি হয়ে পড়েন। আজ মধ্যাহ্নে তুমি গোবিন্দজীর মন্দিরে চরণামৃত

লইবার জন্য ঢুকেছিলে। সেই পবিত্র মন্দিরে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন হিন্দুর প্রবেশ করবার অধিকার নাই। কারণ ব্রাহ্মণগণ দেবতাদের মত সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র শুচি থাকেন। গোবিন্দজীকে অশুচি করে তুমি ঘোরতর অপরাধে অপরাধী হয়েছ। সুতরাং তাঁহাকে পুনরায় অভিষেক ক'রে শুচি করতে হবে, এবং সেই অভিষেকের ব্যয় তোমাকেই বহন করতে হবে। এই ব্যয় বহন করলেই তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হবে। অর্থ ছাড়া কোন অপরাধেরই প্রায়শ্চিত্ত হয় না। তাই ঋষিগণ অল্প ও বহু অর্থ দ্বারা দুই প্রকার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাই করে গিয়েছেন। আমিও তোমার সম্বন্ধে যতদূর সাধ্য অল্প অর্থব্যয়ে প্রায়শ্চিত্তের ফর্দ্দ প্রস্তুত করেছি। এই গ্রহণ কর সেই ফর্দ্দ। তোমার ইচ্ছা হ'লে ফর্দ্দলিখিত দ্রব্যাদি তুমি নিজেই খরিদ করে দিতে পার। নতুবা জিনিষগুলির মূল্য ২০১৲ টাকা নগদ দিলে আমার অন্যান্য শিষ্যগণ বাজার হইতে উহা খরিদ করিয়া এখনি এনে দেবে।"

হরিদাস ফর্দ্দখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিল উহাতে মহোৎসবের খরচ অত্যধিক পরিমাণে ধরা হইয়াছে। সে মনে করিল এই সম্বন্ধে যদি কিছু বলিতে হয় তাহা পরে বলিবে। রাধারাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া যে সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নাই তাহার মীমাংসা গোঁসাই প্রভুর দ্বারা সর্ব্বাগ্রে করাইয়া লওয়াই সে কর্ত্তব্য বিবেচনা করিল।

হরিদাস কাতরভাবে বলিল, "প্রভু, আমি প্রকৃতপক্ষে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করি নাই। মাত্র একখানা পা মন্দির-মধ্যে কতক প্রবেশ করায়ে চরণামৃতের পাত্রটি সম্মুখে টেনে এনেছিলেম। ইহাতে যেমন মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করা হয় নাই, তদ্রূপ গোবিন্দজীকেও স্পর্শ করা হয় নাই। সুতরাং গোবিন্দজী অশুচি হয়েন নাই। আপনি বলছেন আমি অব্রাহ্মণ তাই চিরঅশুচি। অশুচি হয়ে কাহাকেও স্পর্শ করলে স্পৃষ্ট ব্যক্তিও অশুচি হয়ে থাকে। কিন্তু আপনিই যখন বলছেন যে আমি মাত্র মন্দিরে প্রবেশ করেছি, গোবিন্দজীকে স্পর্শ করি নাই, তখন গোবিন্দজী কি ক'রে অশুচি হলেন তাহার অর্থ বুঝতে পারলেম না। মন্দিরের ভিতর একখানা পা ঢুকায়েছি ব'লে মন্দিরটি মাত্র অশুচি হতে পারে এবং উহা গোময় ও গঙ্গাজল দ্বারা পরিষ্কৃত করলেই পুনরায় শুচি হতে পারে। গোবিন্দজীকে এর মধ্যে টেনে আনার দরকার কি? এইরূপ ক্ষুদ্র অপরাধের জন্য এত আতঙ্কের কারণও তো দেখতে পাচ্ছি না, আর এত আড়ম্বর ক'রে গোবিন্দজীর পুনঃঅভিষেক করবারও তো প্রয়োজন হচ্ছে না। আপনার ব্যবস্থায় কি ইহাই বুঝ্‌বো যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর সকল হিন্দুই অশুচি? আমার মত নবশাক জল-আচরণীয় নিষ্ঠাবান হিন্দুও অশুচি?"

গোঁসাই প্রভু একটুকু নরম সুরে উত্তর করিলেন, "আমি তো পূর্ব্বেই বলেছি হরিদাস, ইহা আমার ব্যবস্থা নয়—ইহা

শাস্ত্রের ব্যবস্থা। শিষ্যগণ গুরুর ব্যবস্থাকেও শাস্ত্রের ব্যবস্থা ব'লে জ্ঞান করে থাকে। কারণ গুরু কখনও অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা শিষ্যের জন্য করেন না।"

হরিদাস নম্রভাবে বলিল, "শাস্ত্রের কথাই হ'ক বা গুরু-বাক্যই হ'ক, শিষ্যকে সর্ব্বদা গুরুবাক্য যে পালন করতে হবে তা জানি। তবু মনের ভ্রম দূর করবার জন্য আপনাকে বারম্বার প্রশ্ন করছি, তজ্জন্য যদি অপরাধ হয়ে থাকে তাহা মার্জ্জনা করবেন। শিষ্যের অজ্ঞানরূপ মনান্ধকার দূর করাই গুরুর কর্ত্তব্য। মনে রাখিবেন আমি স্নান ক'রে শুচি হয়েই একখানা পা মাত্র মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করায়েছিলেম। তাতেই কি গোবিন্দজী পর্য্যন্ত অশুচি হয়ে পড়লেন?"

গোঁসাই প্রভু দৃঢ়ভাবে উত্তর করিলেন, "হরিদাস, এবিষয়ে তোমাকে যা বলবার ও বুঝাবার সবই করেছি! তবু যে তুমি বুঝেও বুঝতে পারছ না কেন, তার কারণ তুমিই জান। তোমার অশুচি 'জন্মগত' উহা শত স্নানেও ধৌত হয় না।"

হরিদাস বলিল, "প্রভু আমি প্রকৃতই গোবিন্দজীর ও আমার অশুচি হবার কারণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নাই। আমি শুনেছি সকল হিন্দুরই এক পিতা। জ্যেষ্ঠ যিনি, তিনি নাকি জগৎ পিতা ব্রহ্মার মুখ হ'তে ও একেবারে কনিষ্ঠ যিনি তিনি নাকি তাঁহার পদ হতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। উভয়েরই জন্মদাতা এক। ব্রাহ্মণ জ্যেষ্ঠ ভাই, আর শূদ্র

কনিষ্ঠ ভাই। তাই বলে কি একজন শুচি ও অন্যজন অশুচি হ'তে পারে? দেহের একস্থানে মুখ ও অন্য স্থানে পদ—এই তো বিভিন্নতা: কিন্তু রক্ত মাংস তো এক। প্রভু! বুঝায়ে দিন এক পিতার সন্তান হয়ে আমার অশুচি 'জন্মগত' হ'ল কি ক'রে? আর গোবিন্দজী তো সর্ব্বদাই আমাকে স্পর্শ করে রয়েছেন, তব তিনি কেন এতকাল পরে আজ অশুচি হলেন!"

গোঁসাই প্রভু এবার একটুকু ধীরভাবে উত্তর করিলেন, "হরিদাস, আমি যে এতক্ষণ ধরে তোমাকে যা বুঝালেম সে সব আমার কথাও নয় বা অন্য কারো কথা নয়—সবই শাস্ত্রের কথা। এই সব প্রথা কোন্ এক স্মরণাতীত কাল হ'তে চলে আসছে। সমাজে বাস করতে হ'লে সকল হিন্দুকেই এই সব প্রথা মেনে চলতে হবে—কারণ ইহা শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। এখানে বাপ মা, বা নিরাকার গোবিন্দজীর প্রশ্ন উঠছে না। এতেও যদি তোমার মনের অন্ধকার না ঘুচে থাকে, তবে যদি শক্তি থাকে, চলে যাও ঋষিশ্রেষ্ঠ মনুর নিকট, তিনিই তোমার অন্তরের কালিমা দূর করে দিবেন।" বলিতে বলিতে গোঁসাই প্রভুর চক্ষুর্দ্বয় রক্তিমাকার ধারণ করিল। তিনি তাচ্ছল্যভাবে গাত্রোত্থান করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে যেয়ে বসিলেন।

হরিদাস করযোড়ে কহিল, "প্রভু, এই অধম শিষ্যের প্রতি রাগ করিবেন না। আমি ভগবানের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতা

দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েছি। তাই আরো দু' চারটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হচ্ছে। দয়া করে আমার মনের অন্ধকার দূর করুন। যে প্রথা সমাজ-মধ্যে বহুকাল হ'তে প্রচলিত রয়েছে, তা যদি পক্ষপাত-দুষ্ট হয়, তবে কি এখন আপনারা উহা পরিবর্ত্তন করতে পারেন না? পূর্ব্বে জানতেম না যে, গোবিন্দজী একা ব্রাহ্মণেরই নিজস্ব ধন; উহাতে অন্যের অধিকার নাই। আর আমি প্রকৃতই আমার ও গোবিন্দজীর অশুচির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হলেম না। আমি জানতেম তিনি সকল শ্রেণীর হিন্দুরই গোবিন্দজী। ব্রাহ্মণের এক ঈশ্বর, আর অন্য হিন্দুর অন্য ঈশ্বর, ইহা যে শাস্ত্রের কথা বা গুরু-বাক্য তা এখনো বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না। আমি যদি গোবিন্দজীর নিকট অস্পৃশ্য হয়ে থাকি, তবে ব্রাহ্মণকেও তাঁহার নিকট অস্পৃশ্য ব'লে ধরে নিতে হবে। কারণ, গোবিন্দজীকে ব্রাহ্মণ স্পর্শ করলে গোবিন্দজী যখন অশুচি হচ্ছেন না, আর আমি ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করলে ব্রাহ্মণও অশুচি হচ্ছেন না। সুতরাং আমি গোবিন্দজীকে স্পর্শ করলে গোবিন্দজীও অশুচি হবেন না। ইহা স্বতঃসিদ্ধ বা সহজ সত্য কথা। আর আমি অব্রাহ্মণ বলে যদি সত্য সত্যই অপবিত্র হয়ে থাকি, তবে শুদ্ধ হবার জন্য যিনি চির-পবিত্র সেই ভগবান গোবিন্দজীর চরণ স্পর্শ করে শুচি হবার অধিকার থাকা আমার পক্ষে একান্ত দরকার। গোবিন্দজী চির পবিত্র ও চির শুচি। তিনি কখনো অশুচি হ'তে পারেন

না, এবং তাঁকে অভিষেক দ্বারা শুচি করবার কোন্ দরকারও হ'তে পারে না। রোগীই ঔষধ সেবন করে থাকে। যাঁর কোন রোগ নাই, তাকে ঔষধ সেবন করার কোন দরকারও নাই। এমতাবস্থায় গোবিন্দজীর মন্দিরে প্রবেশ কর্‌বার অথবা তাঁহাকে স্পর্শ কর্‌বার অধিকার যে আমার মত জল-আচরণীয় হিন্দুর নাই, তা তো এখনো বুঝতে পারলেম না। আপনি বল্‌ছেন যে আমি মন্দিরে ঢুকে পাপ করেছি। যদি পাপই করে থাকি, তবে সেই চির-পবিত্র গোবিন্দজীকে স্পর্শ করে পাপ হ'তে মুক্ত হ'তে পার্‌ব না কেন? রোগ হ'লেই ঔষধের ব্যবস্থা রয়েছে। গঙ্গাজল গোবিন্দজীর মত চির পবিত্র, তাই গঙ্গাজলকে স্পর্শ ক'রে মহাপাপীও পাপমুক্ত হ'চ্ছে। আর সেই পবিত্র গঙ্গাজল সকল হিন্দুরই স্পর্শনীয় —উহা একা ব্রাহ্মণের নয়।"

হরিদাসের ন্যায় একজন অল্প-শিক্ষিত নবশাক শিষ্য গোঁসাই প্রভুকে এতগুলি কথা শুনাইবে ইহা তাঁহার অসহ্য হ'য়ে উঠিতেছিল। তিনি ক্রোধে ও অভিমানে কতক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া অবশেষে উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "দেখ হরিদাস, আমার কেন? আমার চৌদ্দ পুরুষেরও এই শাস্ত্রীয় প্রথা পরিবর্ত্তন করা সাধ্য নাই। তুমি আমার সঙ্গে বৃথা তর্ক কর্‌ছ। ইহাতে তোমার যথেষ্ট পাপ হচ্ছে। তুমি ধনী ও প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, তবু সামান্য অর্থের জন্য এইভাবে গুরুর মুখোমুখি হ'য়ে তর্ক কর্‌ছ। ইহাতে কি তোমার লজ্জা

বোধ হচ্ছে না? সকলেরই এক ভগবান, ইহা ধ্রুব সত্য, তা ব'লে কি প্রকৃত অধিকারী ব্যতীত যে-সে লোক তাঁকে স্পর্শ করতে পারে?"

হরিদাস, গোঁসাই প্রভুর চরণ-ধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, "অর্থের জন্য তর্ক করি নাই প্রভু! এই গ্রহণ করুন আপনার ফর্দ্দলিখিত ১০১ ৲ টাকা। দুঃখের বিষয় এই যে, আপনি গুরু হ'য়েও এই ক্ষুদ্র শিষ্যের মনের অন্ধকার দূর করতে পারলেন না। আমি এখনি আমার গোবিন্দজীর নিকট যাচ্ছি। যাঁহার মন্দিরে সকল শ্রেণীর হিন্দুরই প্রবেশ করবার অধিকার রয়েছে। যাঁকে স্পর্শ করবার ক্ষমতা সকল হিন্দুরই আছে। সার্ব্বজনীন দেবমন্দির গঠন করবো, তাতে সার্ব্বজনীন গোবিন্দজী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রচলিত কু-প্রথা দূর করবো। আমি জানি ভগবানের নিকট অস্পৃশ্যতা নাই। ভগবানের চরণে সকল শ্রেণীর হিন্দুরই পুষ্পাঞ্জলি দিবার অধিকার রয়েছে। আমার মনোবাঞ্ছা যতদিন পূর্ণ না হবে ততদিন আর গৃহে ফিরব না। আশীর্ব্বাদ করুন, আমার অভীষ্ট যেন সিদ্ধ হয়।

হরিদাস, গোঁসাই প্রভুর চরণ-ধূলি গ্রহণ করিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে নোট ও টাকাগুলি স্থাপন করিয়া একদিকে চলিয়া গেল। অন্যান্য শিষ্যগণ বুঝিল হরিদাস পাগল হইয়াছে! গোঁসাই প্রভু হরিদাসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতকদূর যাইয়া, "হরিদাস ফের, হরিদাস ফের" বলিয়া ডাকিতে লাগিল কিন্তু

হরিদাস ফিরিল না। হরিদাসের শেষ প্রার্থনা, "আশীর্ব্বাদ করুন, আমার অভীষ্ট যেন সিদ্ধ হয়"—গোঁসাই প্রভুর কর্ণে ও প্রাণের ভিতর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

পরদিবস গোঁসাই প্রভু খুব সংক্ষেপে গোবিন্দজী বিগ্রহের অভিষেকের কার্য্য সম্পাদন করিলেন। মহোৎসবেও যৎসামান্য টাকা ব্যয় করিলেন। উদ্বৃত্ত অর্থগুলি গোঁসাই প্রভুর নিজ তহবিলভুক্ত হইয়া গেল।

৮

হরিদাস বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সেইদিকে তাহার মন একেবারেই প্রবেশ করিল না। এবার সে তাহার গোঁসাই বাড়ী হইতে যে অশান্তির বোঝা বহন করিয়া আনিয়াছে তাহাতে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহার মনের ভিতর সর্ব্বদা একটা প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে, "সে কেন ভগবানের নিকট অস্পৃশ্য হইল? যে ভগবান তাহাকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করিবেন, তাঁহাকে সে ডাকিবে কেন? তাঁহার চরণামৃত পান করিবার জন্য তাঁহারই ঘরে সে ঢুকিতে যাইবে কেন? যদি প্রকৃতপক্ষে অব্রাহ্মণ বলিয়া সে অশুচি হইয়া থাকে তবে, শত ডাকিলেও তো পবিত্র

ভগবান অশুচি হওয়ার ভয়ে তাহাকে চরণে স্থান দিবেন না। তবে পাপী-তাপীর গতি কি হইবে? তবে সে আর কখনো তুলসীতলায় ভগবানের উদ্দেশে হরির লুট দিবে না। ভগবানের বিগ্রহের দুয়ারে অনর্থক সে আর মাথা কুটিবে না। ভগবানের চরণামৃত গ্রহণ করিবার জন্য সে আর ব্যগ্র হইবে না।” এইভাবে তাহার মনকে নাস্তিকতার দিকে টানিতে লাগিল।

হরিদাস ভাবিল, যে ভগবান পক্ষপাত-দুষ্ট, যিনি কেবল ব্রাহ্মণেরই অনুগত; ব্রাহ্মণে খাওয়াইলে যিনি খান; ব্রাহ্মণে স্নান করাইলে যিনি স্নান করেন; ব্রাহ্মণে শোওয়াইলে যিনি শয়ন করেন; যিনি অব্রাহ্মণের ভগবান নহেন; তাঁহার শরণাপন্ন হইলেও তো তিনি দয়া করিবেন না। তবে অব্রাহ্মণগণ কাঁহার নিকট যাইয়া দাঁড়াইবে। তাহারা তবে কাঁহার শরণাপন্ন হইবে। কোথায় গেলে তবে অব্রাহ্মণের ভগবানকে পাওয়া যাইবে। শাস্ত্রে কি তবে অব্রাহ্মণগণের জন্য ভগবানের ভিন্ন মূর্ত্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহা কখনো সম্ভবপর নয়। সকল শ্রেণীর হিন্দুর ভগবানই এক। সেই এক ছাড়া দ্বিতীয় নাই। যদি তাহাই হয় তবে নিশ্চয়ই এইরূপ অস্পৃশ্যতা কেবল সামাজিক ব্যবস্থা। ইহা সমাজ হইতে দূর না করিলে হিন্দু জাতির উন্নতি হইবে না! হিন্দুর গলদ, হিন্দুর দুর্গতি, হিন্দুর দুর্ব্বলতা ঠিক এইস্থানে। ইহার সংস্কার করাই প্রত্যেক হিন্দুর কর্ত্তব্য। যেদিন সমস্ত হিন্দু

ধর্ম্মে, কর্ম্মে, অন্তরে, বাহিরে এক হইয়া এক ভগবানের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারিবে, সেইদিনই হিন্দুর দুর্ব্বলতা দূর হইয়া হিন্দু-সমাজ সুগঠিত ও শক্তিশালী হইবে। তখনি সমগ্র হিন্দুস্থান পুনরায় হিন্দুরাজ্যে পরিণত হইবে। নতুবা ভগবান অনন্ত শক্তিশালী হইলেও কেহ তাঁহাকে সরল বিশ্বাসে মানিতে চাহিবে না। অব্রাহ্মণগণ তবে বাধ্য হইয়াই বুঝিবে, ভগবান বলিয়া বুঝি পৃথিবীতে কেহ নাই। এই যে সৃষ্টি-স্থিতি, লয়-প্রলয়, দিবা-রাত্রি এই সমস্ত বুঝি কোন এক প্রাকৃতিক নিয়মে কোন্ যুগ-যুগান্তর বা কোন্ এক স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আর, যে বিগ্রহ ব্রাহ্মণগণ ভগবান বলিয়া পূজা করিতেছেন উহা প্রস্তরখণ্ড মাত্র।

এই সব চিন্তা-ভাবনার মধ্যে মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের নিরাকার ভগবানের কথা হরিদাসের হৃদয়-মাঝে উদয় হইতে লাগিল। কখন তাহাদের ধর্ম্মকে সর্ব্বাপেক্ষা উদার ও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া, আবার কখন উহা তাহার নিকট বিসদৃশ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যখন সে মনে করিল, তাহাদের ভগবান এক এবং সেই ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করিতে শুচি বা অশুচি হওয়ার দরকার হয় না। কারণ, তাহাদের মন্দিরে অশুচি হইয়া প্রবেশ করিলেও কেহ আপত্তি করে না; তখনি সে হৃদয়ে কতক সময়ের জন্য অপার আনন্দ অনুভব করিত। আবার যখন সে ভাবিত, তাহারা ভগবানকে হিন্দুর মত সাক্ষাৎভাবে পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা পূজা করে না। তাহারা

ভগবানের স্বরূপ কল্পনা করিয়া এবং সেই কল্পিত রূপ গড়িয়া তাহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেয় না। তাহারা কেবল ভগবানের উদ্দেশে স্তব-স্তুতি পাঠ বা মনে মনে তাঁহারই গুণগান ও উপাসনা করিয়া থাকে; তখন তাহার মন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিত। কারণ, সে বুঝিত যাহার উদ্দেশে তাহারা এইরূপ করে তাহাকে তাহারা না দেখিয়াই আরাধনা ও ভক্তি করে। সাকার ভগবানের চরণপ্রান্তে পুষ্পাঞ্জলি পতিত হইয়াছে দেখিয়া হিন্দু যেরূপ তৃপ্তিলাভ করে। নিরাকার ভগবানের চরণ সম্বন্ধে তদ্রূপ প্রত্যক্ষভাবে তৃপ্তিলাভ করিতে তাহারা পারে কিনা তাহার নিকট সন্দেহ হইতে লাগিল। হরিদাস, সুতরাং সাকার বা মূর্ত্তি পূজা ছাড়া ভগবানের মানসিক বা অন্য কোন রকমের পূজা পছন্দ করিল না। সে ভাবিল, সকল জাতির ধর্ম্মই যখন সকল জাতির নিকট উৎকৃষ্ট, তখন সে নিজ ধর্ম্মে থাকিয়া তাহার উৎকর্ষ ও সংস্কার সাধন করিবে। যদি পূজা করিতে হয়, তবে অন্তরস্থিত ভগবানের মূর্ত্তি সম্মুখে স্থাপন করিয়াই পূজা করিবে। নতুবা তাহার তৃষিত হৃদয় যে তৃপ্তিলাভ করিবে না। সহজে অনন্তে তৃপ্তিলাভ করা যায় না। সে যে সীমাহীন, আর তার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু যে সীমাবদ্ধ। অত বড় অসীমকে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকে টানিয়া আনিয়া স্থাপন করা অসম্ভব হইবে। তাই তার হৃদয়ে যতটুকু ধরে ততটুকু করিয়া ভগবানের মূর্ত্তি গড়িয়া সে পূজা করিবে। ভগবানকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া তবে

সে পূজা করিবে। সে কোন অনুমানের ধার ধারিবে না। তবু হিন্দুর সামাজিক পূজা অর্চ্চনার ভাবভঙ্গী দর্শন করিয়া তাহার মনে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আবার সন্দেহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

প্রত্যহ এইরূপ ভগবান সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে হরিদাস একপ্রকার উন্মাদের মত হইয়া উঠিল। সে এখন আর কোন কাজকর্ম্ম করে না; কাহারও সঙ্গে কথা বলে না। কোনদিন আহার করে, আবার কোনদিন অনাহারেই কাটাইয়া দেয়। হরিদাসের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে জ্ঞান করিয়া দোকানের কর্ম্মচারী ও আত্মীয়গণ ভীত হইয়া পড়িল।

হঠাৎ একদিন হরিদাসের মনের ভিতর কে যেন ডাকিয়া বলিল, "ভগবান আছেন—ভগবান আছেন। ঐ গোবিন্দজীর বিগ্রহের ভিতরে তোর ভগবান রয়েছেন। তুই ভগবানের পুত্র। পিতাকে স্পর্শ করবার, পিতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার, পিতার মন্দিরে প্রবেশ করবার পুত্রের সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা অধিকার রয়েছে। দৃঢ় বিশ্বাসী হ'য়ে ভগবানের বিগ্রহ 'গোবিন্দজীকে' মণ্ডপে স্থাপন কর, আর তাঁর পূজা কর। তাঁহার সকল শ্রেণীর হিন্দু পুত্রগণ যাহাতে সেই মন্দিরে প্রবেশ ক'রে সমভাবে পূজা-অর্চ্চনা ও অর্ঘ্য প্রদান করিতে সমর্থ হয় তাহার ব্যবস্থা কর। বিশ্বাসই সাধনা—সাধনা কর্‌লেই সিদ্ধিলাভ করা যায়।"

বীণার ঝঙ্কারের মত এই আশ্বাস-বাণী যখন হরিদাসের

নিরাশ হৃদয়ে বাজিয়া উঠিল, তখন সে এক লম্ফে গাত্রোত্থান করিয়া উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে বলিল, "ভগবান আছেন—ভগবান আছেন। আছেন—আছেন—আছেন। ওগো তোমরা সকলে চলে এসো—চলে এসো। আমার ভগবান গোবিন্দজীর চরণতলে চলে এসো। যে যেখানে যে শ্রেণীর হিন্দু আছ সব চলে এসো। আমার গোবিন্দজী সকল শ্রেণীর হিন্দুকেই চরণে স্থান দিবেন। মন্দিরে প্রবেশ করতে দিবেন। পূজা-অর্চ্চনা ও অর্ঘ্য প্রদান কর্‌বার সকলকেই সমান অধিকার দিবেন। তথায় উচ্চ-নীচ নাই, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ নাই, শুচি-অশুচি নাই। আছে কেবল দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি। তথায় সকলেরই ঠাঁই রয়েছে; তাই বল্‌ছি, দৃঢ়বিশ্বাসী হ'য়ে সকলেই চলে এসো।"

হরিদাসের চীৎকার শুনিয়া অনেকে বুঝিল, আজ বুঝি তাহার উন্মত্ততা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আবার কেহ কেহ কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া চীৎকারের কারণ জানিবার জন্য উহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। উপস্থিত জনতার নিকট হরিদাস আবার চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "ভাই সব, ঈশ্বর আছেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ সকল হিন্দুরই ঈশ্বর। তাঁহার দয়ায় দিন-রাত, আলো-অন্ধকার, সৃষ্টি-স্থিতি, লয়-প্রলয় সবই হচ্ছে। মানুষ ভ্রান্ত, অন্ধ, অজ্ঞান ও কু-সংস্কারপূর্ণ, তাই তাহারা বুঝিয়াও বুঝিতেছে না যে, ভগবান এক ব্রাহ্মণ জাতিকেই তাঁহার পূজার অধিকারী ও

শুচি করে সৃষ্টি করেন নাই। সকল শ্রেণীর হিন্দুকেই সেই অধিকার ও শুচি হবার ক্ষমতা দান করেছেন। ভগবান চির দয়াল—চির শুচি। তাঁহার নিকট শুচি-অশুচি নাই। তিনি আমাদের ন্যায় অব্রাহ্মণকে সর্ব্বদা স্পর্শ ক'রে রয়েছেন, তবু তিনি অশুচি হচ্ছেন না। সূর্য্য-কিরণ যেমন পবিত্র চন্দনকাষ্ঠ ও অপবিত্র বিষ্ঠাকে সমভাবে আলিঙ্গন ক'রে থাকে, তদ্রূপ তিনি সকল শ্রেণীর হিন্দুকেই সমভাবে স্পর্শ ক'রে রয়েছেন। কিন্তু কু-সংস্কার বশতঃ আমাদের সমাজপতিগণ ভগবানকে পক্ষপাত-দুষ্ট ক'রে রেখেছেন। তাই অব্রাহ্মণগণের ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করবার ও ভগবানের বিগ্রহ গোবিন্দজীকে স্পর্শ কর্‌বার অধিকার একেবারেই নাই। প্রবেশ করলেই নাকি মন্দিরসহ গোবিন্দজী অশুচি হয়ে পড়েন। আবার যথেষ্ট অর্থব্যয় করতে পারলেই মন্দির ও গোবিন্দজী শুচি হ'য়ে যায়। এইরূপ ব্যবস্থায় ভগবানের নামে হিন্দুর তীর্থক্ষেত্রে শত শত যাত্রীগণ হইতে কত ধনরত্ন কতভাবে লুণ্ঠিত হচ্ছে। সমাজের এই গলদ দূর কর্‌তেই হবে। সমাজের মধ্যে যতগুলি কু-সংস্কার বিদ্যমান রয়েছে সবগুলি একে একে জাহ্নবী-সলিলে বিসর্জ্জন দিতেই হবে। তবেই অব্রাহ্মণদিগের সামাজিক মুক্তি। এইরূপ মুক্তিলাভ করতে পারলেই, সকল সন্দেহ, সকল সঙ্কোচ, সকলপ্রকার নাস্তিকতা দূর হ'য়ে ভগবানের প্রতি ভক্তির প্রবাহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হবে। তাই বল্‌ছি—এসো ভাইগণ, আমরা সকলে

একত্র হ'য়ে আমাদের সার্ব্বজনীন ভগবানের চরণ-ছায়ায় এসে দাঁড়াই।"

হরিদাসের বক্তৃতা অনেকের নিকট ভাল বোধ হইল। আবার কেহ কেহ উহা পাগলের প্রলাপ জ্ঞান করিয়া স্বীয় স্বীয় গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। হরিদাস মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিল, সে যত শীঘ্র সম্ভব গোবিন্দজীর বিগ্রহ নিজ বাড়ীতে স্থাপন করিয়া নিজেই তাঁহার পূজা করিবে। সকল প্রকার সামাজিক নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও সেই গোবিন্দজীর চরণে সকল সম্প্রদায়ের হিন্দু দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করাইবে। এইভাবে ভগবান সম্বন্ধে অস্পৃশ্যতা সে হিন্দু সমাজ হইতে দূর করিতে চেষ্টা করিবে। আর যদি তাহাতে অকৃতকার্য্য হয় তবে সে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজকে আরো দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে।

হরিদাস চিন্তা করিতে লাগিল, কি করিয়া তাহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হওয়া যায়। এত বড় একটা সার্ব্বজনীন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে সহায় ও সম্পদের দরকার। বর্ত্তমানে তাহার যে সম্পত্তি আছে তদ্দারা সে সামান্যভাবে এই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারে, কিন্তু উহা সাফল্য-মণ্ডিত করিবার সহায় ও শক্তি তাহার নাই। অনেক ভাবনা চিন্তা করিয়া সে নিকটবর্ত্তী গ্রামের কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থা ও সহায়তা প্রার্থনা করিল, কিন্তু সকলেই এইরূপ প্রস্তাবকে পাগলের প্রস্তাব বলিয়া ঘৃণার সহিত তাহাকে

বিদায় করিয়া দিল। কয়েকজন ধনী মহাজনের নিকট তাহার সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করিয়া অর্থ প্রার্থনা করিলে সকলেই তাহাদের অসমর্থতা জ্ঞাপন করিয়া বলিল যে সার্ব্বজনীন দেব-মন্দির ও দেব-পূজা বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুস্থানে প্রচলন অসম্ভব। উহাতে সাম্প্রদায়িকতা আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। অবশেষে হরিদাস প্রধান প্রধান কয়েকটি আখড়ার বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী কয়েকজন মোহান্তের নিকট বিগ্রহ-পূজা-পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, ভগবান গোবিন্দজীর পূজা স্বাধীনভাবে করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ পূজা করিবার অধিকারী হইতে হইবে। এইরূপ অধিকারী হইতে হইলে কৌপীন ও ভেক ধারণ করার বিশেষ আবশ্যক। শেষে "মোহান্ত টীকা" গ্রহণ করিলেই ভগবানের বিগ্রহ পূজার অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু তাহার মধ্যেও যথেষ্ট কঠোরতা সহ্য ও শিক্ষা করিবার পদ্ধতি রহিয়াছে।

হরিদাস এই ব্যবস্থাকে তত সহজ ব্যবস্থা মনে না করিলেও "শুভস্য শীঘ্রং" মনে করিয়া কোন এক শুভদিনে তাহার নিজ বাড়ীতেই মনোগত গেবিন্দজীর মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিল।

হরিদাসের সাংসারিক খরচ বেশী ছিল না বলিয়া সে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই সঞ্চিত অর্থ দ্বারা প্রায় তিন বৎসরে সে মন্দির নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ করিল।

মন্দিরটি উচ্চতায়, দীর্ঘে ও প্রস্থে খুব বৃহৎ ছিল। মন্দিরের পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে মধ্যম রকমের তুইটি প্রকোষ্ঠ বা পূজার ভাণ্ডার-ঘর ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে দীর্ঘ তুইটি বারান্দা ছিল। মন্দিরের মধ্যস্থলে প্রশস্ত একটি প্রকোষ্ঠ, তন্মধ্যে শ্বেত পাথরের শুভ্রবেদী অবস্থিত। এই বেদীর উপরই তাহার সঙ্কল্পিত গোবিন্দজীর প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই প্রকোষ্ঠটী এত বৃহৎ যে অন্যূন পাঁচ শত ভক্ত দণ্ডায়মান হইয়া গোবিন্দজীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে সমর্থ হইবে। মন্দিরের সম্মুখে তিনটি উচ্চ ও প্রশস্ত দরজা। ইহার মধ্য দিয়া মন্দির-প্রাঙ্গনস্থ নর-নারীগণ পূজা ও আরতি অনায়াসে দর্শন করিতে পারিবে। দরজাগুলি লৌহ রেইলিং দ্বারা ঘেরা। তুই পার্শ্বের তুইটি দরজার মধ্যে, একটি মন্দিরে প্রবেশ পথ ও অন্যটি নির্গম পথ। তাহার পরেই দশ ধাপের দীর্ঘ সোপানাবলী। মন্দিরের ললাটদেশে বাঙ্‌লা ও দেবনাগর অক্ষরে উজ্জ্বলভাবে লিখিত রহিয়াছে "সার্ব্বজনীন হিন্দু দেবালয়।"

নূতন ধরণের কোথায় কিছু নির্ম্মিত হইলেই তাহা দর্শন করিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে লোকসমাগম হইয়া থাকে। হরিদাসের নূতন মন্দির দর্শন করিবার জন্যও তিন চারি ক্রোশ দূর হইতে বহু নর-নারী, বালক-বালিকা দলে দলে তাহার বাড়ীতে আসিতে লাগিল। সকলেই মন্দির-গঠন-শিল্পের ভূয়সী প্রশংসা করিল। শৈব, শাক্ত, গাণপত্য ও বৈষ্ণব-

ধর্ম্মাবলম্বীগণ মন্দির-মধ্যে তাহাদের স্বীয় স্বীয় অভীষ্ট দেবতা-মূর্ত্তি স্থাপন করিবার জন্য হরিদাসকে অযাচিতভাবে পরামর্শ দান করিতে লাগিল। কেহ কেহ মন্দির-ললাটে "সার্ব্বজনীন-হিন্দু-দেবালয়" লেখা পাঠ করিয়া ঠাট্টা-তামাসা করিতে লাগিল। অনেক সমাজ-হিতৈষী ঐরূপ লেখার নাম শুনিয়াই ভ্রূ-কুঞ্চন করতঃ ঘৃণা-ভরে মধ্যপথ হইতে নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া গেল। হরিদাস কিন্তু ইহাদের পরামর্শ, সমালোচনা ও অবজ্ঞায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বীয় মনোগত কর্ত্তব্য কাজে মনোনিবেশ করিল।

অর্থের অসচ্ছলতার দরুন এইভাবে আরো একটি বৎসর অতিবাহিত হইল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও মন্দিরে কোন দেবতার বিগ্রহ স্থাপিত হইল না দেখিয়া নানা লোকে নানা প্রকার ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু যাহারা হরিদাসের দৃঢ় বিশ্বাস ও সঙ্কল্পের কথা অবগত ছিল তাহারা বুঝিল শীঘ্রই একদিন তাহারা ঐ মন্দিরে গোবিন্দজীকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে।

মন্দির সম্পূর্ণরূপ প্রস্তুত করিতে হরিদাসের সঞ্চিত ধনের সঙ্গে সঙ্গে দোকানগুলির মূলধনেরও কতক অংশ ব্যয় হইয়া গিয়াছিল। এখন অর্থাভাবে দোকানগুলির কাজ কর্ম্মেরও বিস্তর ক্ষতি হইতে লাগিল। তবু সে মনস্থ করিল যেপ্রকারেই হউক সে গোবিন্দজীর বিগ্রহ, পূজারি ও পূজার জন্য যথেষ্ট অর্থ ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করিবেই করিবে।

দোকানগুলির ও বাড়ীর খরচপত্র খুব সংক্ষেপ করিয়া সে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিবার জন্য আরো এক বৎসর বাড়ীতে অপেক্ষা করিল। এই সময়ের মধ্যে তাহাকে সমাজের অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। অবশেষে সে তাহার গোঁসাই বাড়ী পরিত্যাগের পাঁচ বৎসর পরে গৃহত্যাগ করিয়া নবদ্বীপাভিমুখে চলিয়া গেল। দোকানের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীবর্গ তাহার অনুপস্থিতিতে দোকান ও বাড়ীর যাবতীয় কাজকর্ম্ম পরিচালন করিতে লাগিল।

৯

হরিদাস নবদ্বীপে আসিয়া প্রথমতঃ তাহার পিতার অনুসন্ধান করিল। শেষে গোবিন্দজীর বিগ্রহ ও উপযুক্ত পূজারি সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার পিতার সন্ধান কেহ বলিতে পারিল না। পূজারি অনেক মিলিল কিন্তু তাহার মনোমত উপযুক্ত পূজারি মিলিল না। নবদ্বীপবাসী মোহান্তগণ গোবিন্দজীর প্রস্তরমূর্ত্তি কাশী বা বৃন্দাবন হইতে সংগ্রহ করিতে পরামর্শ দিলেন। হরিদাস, বৃন্দাবন যাওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া নবদ্বীপ ত্যাগ করিল। সে নবদ্বীপে মাসাধিক কাল অবস্থান করিয়া প্রত্যেক ঠাকুর বাড়ীতে প্রত্যহ ভক্তি সহকারে পূজা ও আরতি দর্শন, এবং কীর্ত্তন ও

পাঠ শ্রবণ করিত। সকল দেবালয়েই সে দেখিতে পাইল ব্রাহ্মণ বা ভেকধারী পূজারি ব্যতীত অন্য কাহারও বিগ্রহ স্পর্শ করিবার অধিকার নাই। সে দেখিল এই শ্রীগৌর-পদাঙ্ক ভূমিতে উদার ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরেও "ভেট" প্রথার প্রচলন রহিয়াছে। অর্থ ছাড়া ভগবানকে দর্শন করিবার অধিকার কোন ব্রাহ্মণেতর জাতির নাই। ইহাতে সে প্রাণে বড় আঘাত পাইতে লাগিল। সে আরো দেখিতে পাইল কোন কোন দেবালয়ের মোহান্তদিগের বহু সেবাদাসী রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে ইহারা স্বামী স্ত্রীর ন্যায় সংসার পাতিয়া রহিয়াছে। যে সকল সংসার-বিরাগীগণ ভগবানকে পাইবার জন্য একদিন বৈরাগ্য বেশে সংসার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া তীর্থক্ষেত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা কেন যে সেই তীর্থক্ষেত্রে আর একটা কৃত্রিম সংসার গড়িয়া নবদ্বীপে পড়িয়া রহিয়াছে ইহার কারণ সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। এই সব ব্যভিচার দর্শন করিয়া তাহার মনে সমাজের উপর অধিকতর ঘৃণার উদ্রেক হইল। অবশেষে সে তাড়াতাড়ি বৃন্দাবনাভিমুখে চলিয়া গেল।

বহু পর্য্যটনের পর হরিদাস বৃন্দাবনধামে উপস্থিত হইয়া তাহার পিতার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। কয়েক মাস ভরিয়া সে বৃন্দাবনের প্রত্যেক কুঞ্জে, হাটে, মাঠে, যমুনাতীরে, দেবালয়ে ও ধর্ম্মশালায় পিতার অনুসন্ধান করিল, কিন্তু

কোথায়ও তাঁহার দর্শন পাইল না। অন্য কেহও তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিতে সমর্থ হইল না। বৃন্দাবনের বিপণিগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ প্রস্তর ও ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াও তাহা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিল না। কারণ, সে মনে মনে স্থির করিল ভগবানের বিগ্রহ স্থাপন ও পূজা-অর্চ্চনাদি করিতে হইলে পিতার অনুমতি আবশ্যক, তাই সে সর্ব্বপ্রথম পিতার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। বৃন্দাবনের অনেক দেবালয়ে সে ব্রজবাসী পূজারি, আবার কোন কোন দেবালয়ে অন্য দেশীয় ব্রাহ্মণ পূজারি রহিয়াছে দেখিতে পাইল। কিন্তু দেখিল নবদ্বীপের ন্যায় প্রায় সকল দেবালয়েই স্পর্শ-দোষ ও "ভেট" প্রথার প্রচলন বিদ্যমান রহিয়াছে। তথায় পূজারি ব্যতীত অন্য কাহারও বিগ্রহ স্পর্শ বা পূজা করিবার অধিকার নাই। এই বিষয় লইয়া সে কতিপয় সাধু সন্ন্যাসী ও ব্রজবাসীর সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করিয়াও তাহার মনোমত উত্তর পাইল না। অবশেষে সে ভগ্ন-হৃদয়ে পিতার উদ্দেশে মথুরার দিকে চলিয়া গেল।

মথুরাতে উপস্থিত হইয়া হরিদাস তাহার মনোগত সঙ্কল্প অনেকের নিকট প্রকাশ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে পিতার অনুসন্ধান করিল। এখানেও কেহ তাহার পিতার সন্ধান বলিয়া দিতে পারিল না। এখানেও সে দেখিল দেবালয়ে যাত্রীগণের বিগ্রহ স্পর্শ করিবার বা বিগ্রহ-চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার অধিকার নাই। যাত্রীগণ মন্দির-প্রাঙ্গণে অথবা

বারান্দায় দাঁড়াইয়া পূজা ও আরতি দর্শন করে, আর পূজারি-প্রদত্ত বিগ্রহের চরণামৃত গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়।

একদা সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে হরিদাস যমুনাতীরস্থ সোপানাবলীতে দাঁড়াইয়া সাধু সন্ন্যাসীদিগের ক্রিয়াকলাপ দর্শন করিতেছিল। সে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আরো দেখিতেছিল যমুনাস্থ বৃহৎ বৃহৎ কচ্ছপের জলক্রীড়া। এই সময় হঠাৎ এক সাধুকে দেখিয়া তাহার পরিচিত লোক বলিয়া বোধ হইল। সাধু ডুবন্ত তপনের দিকে মুখ রাখিয়া ধ্যানে নিমগ্ন ছিল। হরিদাস এই সুবিধায় সাধুকে ভাল করিয়া চিনিয়া লইল।

সাধুর ধ্যান ভগ্ন হইলে হরিদাস ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো নিতাই দাদা, কবে হ'তে মথুরায় রয়েছ? আমরা ভেবেছিলেম তুমি বুঝি ধলেশ্বরীতে ডুবে মরেছ। বাবা তোমাকে অনেক তালাস ক'রে হয়রাণ হয়েছিলেন।"

সাধু হরিদাসের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া ঈষৎ হাসির সহিত উত্তর করিল, "আমি এখানে অনেককাল যাবত আছি। তুমি কবে এলে হরিদাস? তোমার মত ব্যবসায়ীর এত দূরদেশে আসবার কারণ কি? তোমাদের দোকানগুলির কাজকর্ম্ম ভাল মত চলছে তো?"

হরিদাস বলিল, সপ্তাহখানেক হ'ল বাবার তাল্লাসে এখানে এসেছি। নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে তাঁকে খুঁজিয়া পাই নাই।

এখানেও কেহ তাঁহার সন্ধান ব'লে দিতে পারলে না। তিনি বৃন্দাবনেই বাস করবেন বলে বাড়ীতে বলে এসেছেন। বোধ হচ্ছে তিনি বেঁচে নাই।" ইহা বলিতে বলিতে হরিদাসের দুই চোখ দিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

নিতাই ওরফে নিত্যানন্দ সাহার বাড়ী হরিদাসের বাড়ী হইতে মাত্র দুই ক্রোশ দূরে। সে তালতলা বন্দরে হরিদাসের পিতার গদির প্রধান কর্ম্মচারী ছিল। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় কপালে তিলক কাটিয়া এবং সর্ব্বশরীরে হরি ও কৃষ্ণ নামের ছাপ লাগাইয়া সংকীর্ত্তন করিত। কখন কখন ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যাইত। এইমত পরম বৈষ্ণব ও সাধুর দোকানে কোনরূপ ছল-চাতুরী থাকিতে পারে না জ্ঞান করিয়া দলে দলে খরিদ্দারগণ নিতাইয়ের দোকানে জিনিষপত্র খরিদ করিত। এইজন্য খরিদ্দারের সংখ্যা অন্য দোকানগুলি হইতে নিতাইয়ের দোকানে অত্যধিক ছিল। সুতরাং নিতাইয়ের আমলে হরিদাসের পিতার তালতলার গদীর দিন দিন আয় বৃদ্ধি হইয়া শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল।

এক নিদাঘ-সায়াহ্নে গৌরাঙ্গ-লীলা কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাবাবেশে নিত্যানন্দ মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার চৈতন্য সঞ্চার হইল না দেখিয়া অন্যান্য কীর্ত্তনকারীগণ তাহাকে ঐ অবস্থায় গদিতে শোয়াইয়া রাখিয়া নিজ নিজ বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছিল। প্রাতে ফিরিয়া আসিয়া

আর তাহাকে কেহ দেখিতে পাইল না। সেই অবধি নিত্যানন্দ নিরুদ্দেশ। হরিদাসের পিতা ঈশ্বর মণ্ডল তাহাকে অনেক স্থানে খুঁজিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে ব্যর্থ চেষ্টা বহন করিয়া ঘরে ফিরিতে হইয়াছিল। অবশেষে তাহারা মনে করিয়াছিল, হয় তো নিতাই ভাবাবেশে ধলেশ্বরীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, অথবা মনের আবেগে কোন এক সুদূর তীর্থে চলিয়া গিয়াছে। অনেক বৎসর পরে নিতাইয়ের সঙ্গে হরিদাসের আজ যমুনা-তীরে দেখা হইল।

হরিদাস বলিল, "আর কেন নিতাই দাদা, চল আমরা দেশে ফিরে যাই। সেখানে তুমি আমার অনুষ্ঠিত কাজে সহায়তা ক'রে হৃদয়ে যথেষ্ট আনন্দলাভ করতে পারবে। ধলেশ্বরীতে তো ডুবে থাকতে পারই নাই, এখন চল, সেখানে গোবিন্দজীর প্রেম-সাগরে ডুবে ধন্য হ'য়ে যাবে।"

নিত্যানন্দ বলিল, "ডুবা কি সহজ কথা? ডুব তো কতই দিচ্ছি, কিন্তু একেবারে ডুবে থাকতে পারলেম কৈ ভাই? একটা নদীতেই যখন ডুবে থাকতে পারি নাই, তখন তুমি আবার একটা সাগরতলে ডুবে থাকবার জন্য অনুরোধ করছ? জীবন ভ'রেই তো গোবিন্দজীর প্রেম-সাগরে ডুবাচ্ছি, কিন্তু কৈ, একেবারে তো ডুবতে পারলেম না। ডুবিবার মত ডুব দিতেই যে শিখলেম না হরিদাস! অভিজ্ঞ ডুবুরীর মত ডুব দিতে জানলে সাগরতল হ'তে গোবিন্দ-রত্ন নিশ্চয়ই সংগ্রহ ক'রে আনতে পারতেম। আমরা যেভাবে ডুবাচ্ছি, উহা তো

ডুব নয়—কেবল জলকেলি মাত্র। যদি প্রকৃত ডুব দিতে জানতেম, তবে কোন্‌দিন এই যমুনার অতল-জলে ডুবিয়ে রাধাকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করতে পারতেম। তাঁরা তো এই যমুনারই অপর তীরে বৃন্দাবন-পাদ বিধৌত কল্লোলিনী কালিন্দীর মধুর মলয়-মারুত-সঞ্চালিত মৃদু তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে জলকেলি করেছিলেন। আমার কখন কখন মনে হচ্ছে তাঁরা বুঝি আজও সেই তটিনী-তরঙ্গে খেলা করছেন।" নিতাই আর বলিতে পারিল না। ভাবাবেশে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

হরিদাস দেখিল ভগবদ্ভক্তিতে নিতাইয়ের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। দুই চক্ষু হইতে জল-ধারা পড়িতেছে। সে যেন সহসা প্রস্তরমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। তাহার তন্ময়তা দর্শন করিয়া হরিদাসের শরীরও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে বুঝিল, এমনটি না হইলে কি কেহ সহসা সংসার ত্যাগ করিয়া গোবিন্দজীর উদ্দেশে এত দূরদেশে আসিতে পারে?

নিত্যানন্দ কিছুকাল এইভাবে তন্ময় থাকিয়া আবার যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইল তখন বলিতে লাগিল, "হরিদাস, সেই সময়ের কথা আজ মনে হচ্ছে। তুমি বাল্যকালে বিদ্যালয় হ'তে এসেই আমার কাছে মিঠাই খাবার জন্য পয়সা চাইতে। আর আজ তুমি কত বড় হ'য়ে পড়েছ। ব্যবসা-বাণিজ্যেও নাকি খুব দক্ষ কারবারি হ'য়ে উঠেছ।

আজ তোমাকে এই দূরদেশে দেখতে পেয়ে খুব সুখী হলেম।"

হরিদাস তাহার পিতার গৃহত্যাগ হইতে নিজের গৃহত্যাগ পর্য্যন্ত সব ঘটনা একে একে নিতাইয়ের নিকট বলিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা নিতাই দাদা, তুমি কোথা হ'তে জান্তে পারলে যে, আমি ব্যবসা-বাণিজ্যে একজন পাকা কারবারি হ'য়ে পড়েছি ?"

নিত্যানন্দ উত্তর করিল, "অনেকদিন হয় বৃন্দাবনধামে তোমার পিতার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় তাঁহার নিকট শুনেছিলেম।"

হরিদাস আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে বলিল, "তবে কি তিনি জীবিত আছেন ? বল বল নিতাই দাদা, তিনি এখন কোথায় কি অবস্থায় রয়েছেন। তাঁকে দেখবার জন্য আমি যে পাগলের মত দেশে দেশে ঘুরছি।"

নিত্যানন্দ বলিল, "তিনি এই মথুরা সহরের এক ক্রোশ উত্তরে এক প্রসিদ্ধ পল্লীতে আশ্রম প্রস্তুত ক'রে বাস ক'রছেন। ঈশ্বর মণ্ডল বল্লে কেহ তাঁকে চিন্‌বে না। তাঁর বর্ত্তমান নাম হ'য়েছে, 'প্রেমানন্দ স্বামী মোহান্ত বাবাজী'। এই নাম বল্লে বৃন্দাবনেও তাঁর অনুসন্ধান পেতে। তিনি এখন কৌপীনধারী পরম বৈষ্ণব। তিনি বিখ্যাত নির্ম্মলানন্দ স্বামী ভারতীর শিষ্য। আমার মত তাঁর অনেক শিষ্য নানা স্থানে রয়েছে। তাঁর স্থাপিত মদনমোহন জীউ সকল হিন্দুরই

স্পৃশ্য। প্রত্যহ শত শত নরনারী মধ্যাহ্ন-পূজার সময় ঠাকুর মদনমোহনের চরণতলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে কৃতার্থ হচ্ছে। ঐ দেখ সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে। আশ্রমে পৌঁছুতে সান্ধ্য-আরতির সময় অতীত হ'য়ে যেতে পারে। চল যাই, আমরা তু'জনে আশ্রমে যেয়ে ঠাকুর মদনমোহনের আরতি দর্শন করিগে।"

ভক্ত নিত্যানন্দ যখন হরিদাসকে নিয়া আশ্রমে পৌঁছিল তখন ঠাকুর মদনমোহন জীউর আরতি হইতেছিল। ধূপ, গুগগুল্, সদ্য প্রস্ফুটিত নানাবিধ পুষ্প-মাল্যের ও অগুরু চন্দনাদির তীব্র ও স্নিগ্ধ সৌরভে আশ্রম আমোদিত হইয়া উঠিয়াছিল। শঙ্খ, ঘন্টা, কাঁসরের শব্দে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়াছিল, আর মন্দির-প্রাঙ্গণ শত শত নর-নারীতে পূর্ণ হইয়াছিল। বৃদ্ধ পূজারি আরতি করিতে করিতে সময় সময় ভগবৎ প্রেমে আত্মহারা হইয়া পড়িতেছিল। তাঁহার দক্ষিণ হস্তের পঞ্চপ্রদীপ যেন কাঁপিতেছিল, আর বাম হস্তের ঘন্টা-ধ্বনি যেন ক্ষণকালের জন্য নীরবতা প্রাপ্ত হইতেছিল। এ যে পূজারির ভগবদ্ভক্তির পূর্ণাবেশ।

পূজারির তন্ময়তা পুনরায় দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই দৃঢ় হস্তের পঞ্চপ্রদীপ নৃত্য করিয়া উঠিল। ঘন্টা আবার মধুর রবে বাজিতে লাগিল। মোহান্ত পূজারীও আবার আরতির তালে-তালে নাচিতে লাগিল। এই ভাবে প্রায় এক ঘন্টা অতিবাহিত হইলে আরতি শেষ হইল। উপস্থিত নর-নারীগণ ভক্তিভরে ঠাকুর মদনমোহনের দরজায় মাথা কুটিতে লাগিল।

মোহান্ত বাবাজী সকলকে বিগ্রহের চরণামৃত পান করাইয়া প্রত্যেককে আশীর্ব্বাদ করিলেন। নর-নারীগণ স্বীয় স্বীয় আবাসে চলিয়া গেল। যাহারা দেবালয়ে রহিল তাহারা খোল ও করতাল সংযোগে ঠাকুর মদনমোহনের লীলা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। এইভাবে রাত্রি দশ ঘটিকার সময় কীর্ত্তন শেষ হইল।

যখন মন্দির-প্রাঙ্গণ নিস্তব্ধ হইল, তখন বৃদ্ধ মোহান্ত পূজারি মন্দির হইতে অবতরণ করিয়া হরিদাসের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। হরিদাস পিতার চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া নমস্কার করিল। তাহার পরে এক ঘণ্টা ধরিয়া পিতা-পুত্রে অনেক আলাপ হইল। পিতা তাঁহার গৃহত্যাগ হইতে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা পুত্রকে শুনাইলেন। পুত্রও পিতার গৃহত্যাগ হইতে আজ পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনা পিতার নিকট নিবেদন করিল। সে তাহার দৃঢ়সঙ্কল্পের কথা জানাইয়া বলিল যে সে তাহার নিজ বাড়ীতে "সার্ব্বজনীন-হিন্দু-দেবালয়" নির্ম্মাণ করিয়া আসিয়াছে। এখন উহাতে ঠাকুর গোবিন্দজীর বিগ্রহ মূর্ত্তি স্থাপন করিতে পারিলেই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। সেই উদ্দেশে, আর পিতার অনুমতি গ্রহণ জন্য সে এই দূরদেশে আসিয়াছে। বিগ্রহ স্থাপন করিতে যথেষ্ট ধন ও সহায়তার দরকার। তাই পিতার উপদেশ ও সাহায্য বিশেষ আবশ্যক। আর যদি তাহার সঙ্কল্প সে কার্য্যে পরিণত করিতে না পারে এবং তাহার এতদিনের সাধনায় যদি সিদ্ধি লাভ না হয়, তবে

সে নিশ্চয়ই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবে। কারণ হিন্দুর বর্ত্তমান পূজা-পদ্ধতিতে তাহার বিরাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

বৃদ্ধ মোহান্ত পূজারি, হরিদাসের সমস্ত কথা শুনিয়া আনন্দে অশ্রু ত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন, "হরিদাস, তোমার উদ্দেশ্য মহৎ ও সাধু। তোমাকে ঠাকুর গোবিন্দজীর প্রতি অচল ভক্তি-পরায়ণ দর্শন ক'রে আমি গৌরব অনুভব করছি। এইরূপ সৎকর্ম্মে যে বহু বিঘ্ন আছে তাহা তুমি অবশ্য জান। বিশেষতঃ আমাদের বাঙ্‌লা বা ব্রাহ্মণ পরিচালিত দেশে এইরূপ সার্ব্বজনীন-হিন্দু-দেবালয় প্রতিষ্ঠা করা চলিবে কিনা সন্দেহ। তবে সেই ভগবান গোবিন্দজীর অনুগ্রহ হ'লেই অসম্ভবও সম্ভব হবে। এখানেও আমি ঐরূপ দেবালয় প্রতিষ্ঠা করতে প্রথম প্রথম অনেক বাধা পেয়েছিলুম। ঠাকুর মদনমোহনের কৃপায় এখন সব বাধা বিঘ্ন দূর হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু এইরূপ একটি কি দুইটি দেবালয়ে আমাদের হিন্দু-সমাজের সংস্কার সাধিত হওয়া দুষ্কর। এই বিশাল হিন্দুস্থানের প্রদেশে প্রদেশে এইরূপ অসংখ্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত দরকার। একমাত্র আমরা পিতা-পুত্রে চেষ্টা করিয়া যে সাফল্য লাভ করিতে পারিব এমন সম্ভব নয়। সমগ্র হিন্দুজাতির একতা ও একাগ্রতার উপর এইরূপ সার্ব্বজনীন কার্য্য নির্ভর করে। তবে যতদূর সম্ভব ধীরে ধীরে কাজ করিতে থাকিলে এই দিকে সমস্ত হিন্দুর মন লৌহ-চুম্বকবৎ আকৃষ্ট হ'তে পারে। এখন আমাদের হিন্দুস্থান

আর পূর্ব্বের হিন্দুস্থান নাই, তাই ইহার অন্য নাম হয়েছে। এখন এখানে নানা ধর্ম্মাবলম্বী নানা জাতির স্থান হ'য়ে পড়েছে। তারা বর্ত্তমান হিন্দুজাতিকে বিভিন্ন জাতি বলে মনে করে। তাদের বিশ্বাস এই বিভিন্ন হিন্দুগণ চিরকালই বিভিন্ন হ'য়ে থাক্‌বে। ইহাদের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে একতা অসম্ভব। তাই এখন হিন্দু সমাজ হ'তে প্রথমতঃ অস্পৃশ্যতা দূর করা নিতান্ত দরকার হয়ে পড়েছে, সকল শ্রেণীর হিন্দুগণ একত্র হয়ে যাহাতে ভগবানের চরণে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করতে পারে তার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে করতে হবে। কিন্তু এইভাবে অস্পৃশ্যতা দূর হলেই যে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়তে হবে সেইরূপ ইচ্ছা আমি এখনও করি না। উহা ভবিষ্যতের কালস্রোতের উপর নির্ভর করবে। ভগবানের চরণে উপস্থিত হ'তে সমস্ত শ্রেণীর হিন্দুর পক্ষে যাহাতে জাতি বিচার না থাকে তাহাই আমাদের বর্ত্তমান অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এই সৎউদ্দেশ্যকে যদিও কোন শ্রেণীর হিন্দু অসৎ বা অসম্ভব বলে মনে করে, তত্রাচ আমরা দমিব না। আমাদের সঙ্কল্প ধীরে ধীরে কার্য্যে পরিণত করবো।”

এতগুলি কথা বলিয়া মোহান্ত পূজারি ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন। পরে আবার বলিতে লাগিলেন, “হরিদাস, তোমার এই শুভ সঙ্কল্প সুসিদ্ধ করিতে আমিও তোমার সঙ্গে বঙ্গদেশে ফিরে যাব। তথায় এইরূপ একাধিক হিন্দু দেবালয় প্রতিষ্ঠা করার একান্ত দরকার। আমার নিকট কিছু সঞ্চিত অর্থ

রয়েছে। যদিও উহা ঠাকুর মদনমোহনের সম্পত্তি, তবু উহা ঠাকুর গোবিন্দজীর সেবায় ব্যয় করিলে অন্যায় হবে না। কারণ, মদনমোহন আর গোবিন্দজী এক। ভক্ত নিত্যানন্দের উপর ঠাকুর মদনমোহনের সেবার ভার দিয়ে কল্যই তোমার সঙ্গে বঙ্গদেশাভিমুখে রওনা হব। শুভকাজে বিলম্ব করা উচিত নয়।"

ভগবান যে এত শীঘ্র ও সহজে হরিদাসের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন ইহা স্মরণ করিয়া হরিদাসের হৃদয় ঠাকুর গোবিন্দজীর প্রতি অধিকতর ভাবে আকৃষ্ট হইল। সে ভাবিল এ কাজে নিশ্চয়ই গোবিন্দজীর দয়া রয়েছে নতুবা এত সহজে অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। হরিদাসের হৃদয় আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল তাই বুঝি গোবিন্দজীর অন্য নাম "বাঞ্ছাকল্পতরু"।

হরিদাস পিতাকে বলিল, "বাবা, আপনি যখন নিজেই আমার সাহায্য করিবার জন্য দেশে ফিরে যেতে চেয়েছেন, তখন আমার আর কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নাই। এখন মনোমত একটি দেবালয় স্থাপন করতে পারলেই যথেষ্ট হবে। শেষে আমাদের দেখাদেখি সামাজিকগণ এইরূপ বহু দেবালয় অচিরে নানাস্থানে স্থাপন করবেন। তখন তাঁহারা তাঁদের কুসংস্কার দূর করে আমাদের সঙ্গে মিশে পড়বেন। এখন ঠাকুর গোবিন্দজীর বিগ্রহ মূর্ত্তি সংগ্রহ করতে হবে। ধাতু-নির্ম্মিত না হ'লেও প্রস্তর-নির্ম্মিত হ'লেও চলবে।"

পিতা বলিলেন, "তজ্জন্য চিন্তা করো না হরিদাস। ঐ যে

ঠাকুর মদনমোহনের দক্ষিণ পার্শ্বে ধাতুনির্ম্মিত বিগ্রহ দেখতে পাচ্ছ, উহাই ঠাকুর গোবিন্দজীর মূর্ত্তি। এই বিগ্রহকে বঙ্গ-দেশে স্থানান্তরিত করবো। ইহাই ঠাকুরের অভিপ্রেত ও স্বপ্নাদেশ জানবে।"

এইরূপ প্রস্তাব ও আলোচনার পর আশ্রমের ভবিষ্যৎ বন্দোবস্ত ও ঠাকুর মদনমোহনের পূজার ও অন্যান্য কাজ-কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতেই সমস্ত রাত্রিখানা কাটিয়া গেল। পরদিবস প্রত্যূষে পিতা ও পুত্র গোবিন্দজীর বিগ্রহ সহ দেশের দিকে রওনা হইল।

১০

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অদৃষ্ট যাহার মন্দ, সে স্বর্গে বাস করিলেও সুখী হয় না। যদিও গোঁসাই বাড়ীতে রাধারাণী সুখে কাটাইবে এই আশা করিয়া আসিয়াছিল এবং কতক আদর ও যত্নের মধ্য দিয়াই তার দিনগুলি কাটাইতেছিল, কিন্তু শেষে তাহার সেখানে তিষ্ঠান কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। কয়েক বৎসর যাবত তাহার দাদা হরিদাসও তাহার খোঁজ খবর লওয়ার জন্য গোঁসাই বাড়ীতে আসিতেছে না। সে লোক মুখে শুনিয়াছিল যে তাহার দাদাও পিতার ন্যায় গৃহ ত্যাগ করিয়া পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে।

রাধারাণী ক্রমশঃ গোঁসাই প্রভুর শিষ্যাদিগের মধ্যে "প্রধানা" হইতে সমর্থা হইয়াছিল। গোঁসাই প্রভু তাহাকে যেরূপ আদর ও যত্ন করিতেন আর ভাল বাসিতেন অন্য কোন শিষ্যাকে তদ্রূপ করিতেন না। পূর্ব্বে যে সব শিষ্যা গোঁসাই প্রভুর অধিকতর প্রিয়তমা ও আদরিণী ছিল, রাধারাণীর আসার পর হইতে তাহাদের ভাগ্যে সেই আদর ও ভালবাসায় ভাটা পড়িয়াছিল। রাধারাণীর শত অপরাধ গোঁসাই প্রভু উপেক্ষা করিতেন; কিন্তু অন্য কেহ সামান্য অপরাধ করিলে তিনি তাহাকে নির্য্যাতন না করিয়া ছাড়িতেন না। এইরূপ পক্ষপাতিত্ব অন্যান্য শিষ্যাদিগের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। সুতরাং তাহারা গোঁসাই-পত্নীকে হাত করিবার জন্য রাধারাণীর বিরুদ্ধে সত্য মিথ্যা নানা কথা বচনা করিয়া অনবরত শুনাইতে লাগিল। গোঁসাই প্রভু রাধারাণীকে অস্বাভাবিক ভাবে ভাল বাসিতেন বলিয়া গোঁসাই-পত্নী সর্ব্বদা রাধারাণীকে হিংসার চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু স্বামীর বিরাগভাজন হইবার ভয়ে এতদিন প্রকাশ্য ভাবে কাহাকেও তাঁহার মনোগত ভাব জানিতে দেন নাই। এখন অন্যান্য শিষ্যাদিগের সহায়তা লাভ করিয়া এবং তাহাদের সত্য মিথ্যা সকল কথায় বিশ্বাস করিয়া সময় সময় রাধারাণীকে নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন।

এতকাল "কিশোরী ভোজনের" সময় গোঁসাই-পত্নীই "প্রধানা" বলিয়া গণ্যা হইতেন; কিন্তু রাধারাণী গোঁসাই বাড়ী আসিবার কয়েক মাস পর হইতেই সেই "প্রধানার" স্থান

রাধারাণী অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এই অপমানে আজকাল আর গোঁসাই-পত্নী "কিশোরী ভোজনে" যোগদান করিতেন না। গোঁসাই প্রভু সময় সময় ইহাতে মৌখিক আপত্তি করিলেও অন্তরে অন্তরে সন্তুষ্ট থাকিতেন। রাধারাণীকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার জন্য গোঁসাই-পত্নী অনেকবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। সুতরাং মনের প্রতিহিংসা মনে চাপিয়া রাখিয়া কোন এক সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন হইল "বার্ষিকী" আদায় করিবার জন্য গোঁসাই প্রভু দূরদেশস্থ শিষ্যালয়ে চলিয়া গিয়াছেন। এবার তাঁহার বাড়ী ফিরিতে দুই কি তিন মাস লাগিবার সম্ভব। তিনি জানিতেন তাঁহার অনুপস্থিতে রাধারাণীর অনেক কষ্ট হইবে। সে হয়তো অনেক নির্য্যাতনও ভোগ করিতে পারে। এইজন্য টাকা পয়সার অভাব হইলেও "বার্ষিকী" আদায় করিবার জন্য এতদিন তিনি দূরদেশে গমন করেন নাই। কিন্তু এবার অর্থের ভীষণ অনটনের কষ্টকর নিপীড়নে বাধ্য হইয়াই দূরদেশে যাত্রা করিয়াছেন। যাইবার পূর্ব্বে রাধারাণীর যাহাতে কোনরূপ অযত্ন না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য গোঁসাই-পত্নী ও বাড়ীস্থ অন্যান্য লোকজনকে বিশেষভাবে বলিয়া গিয়াছেন।

এতদিন পরে সুবিধা পাইয়া গোঁসাই-পত্নী রাধারাণীকে তাহার পিসীমার নিকট ফিরিয়া যাইবার জন্য বারম্বার

অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাহাকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করিবার এত আগ্রহ দর্শন করিয়া রাধারাণীর চক্ষে জল আসিল। এতকাল পরে আবার তাহার সেই মাঠস্থ পুকুরে জল আনিতে যাওয়া, পথিমধ্যে চিঠি কুড়াইয়া পাওয়া এবং গ্রামবাসীদিগের মিথ্যা অপবাদ রটনাদি সব কথা মনে পড়িতে লাগিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার গোঁসাই-মার চরণ-ধুলি গ্রহণ করিয়া বলিল, "তথায় যে আমার স্থান নাই মা। পিসীমা একেবারে বৃদ্ধা হ'য়ে পড়েছেন। বাবা ও দাদা বহুদিন যাবত গৃহত্যাগী। সেখানে আমার মত মেয়েকে রক্ষা করবার লোক নাই। তাই আপনার চরণতলে আশ্রয় নিয়েছি। এখন আপনিও যদি এই হতভাগিনীকে ত্যাগ করেন, তবে আমি আর কোথায় দাঁড়াব মা? বাবা কি দাদা দেশে ফিরে এলেই আমি এখান হ'তে চলে যাব। আর কয়েকটা দিন আপনার চরণতলে এ হতভাগিনীকে স্থান দিন।"

গোঁসাই-পত্নী অগত্যা মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "তবে তোমার সেখানে যেয়ে কাজ নাই বাছা। তোমার যতকাল ইচ্ছা এখানেই থাক্‌তে পারবে। আমার তো ছেলে-মেয়ে নাই; তোমরাই আমার ছেলে-মেয়ে।"

সেইদিন হইতে গোঁসাই-পত্নী রাধারাণীর সঙ্গে খুব ভাব দিয়া চলিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে সামান্য দোষের জন্য যে রাধারাণীকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতেন, আজকাল

তাহার শত দোষ তিনি উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এখন সর্ব্বদা রাধারাণীর সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। সেই কৃত্রিম হাসি মুখে ফুটিলেও চোখে ফুটিত না। তবু সরল-হৃদয়া রাধারাণী উহা প্রকৃত ভালবাসার চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে লাগিল। এতকাল পরে তাহার গোঁসাই-মার নিকট অযাচিত স্নেহ ও আদর পাইয়া সে সময় সময় একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া শান্তি পাইতে লাগিল। তাহার সরল মনে গোঁসাই-পত্নীর কুটিলতা একেবারেই স্থান পাইল না। সে যে এতকাল গোঁসাই প্রভুর যথেষ্ট আদর ও ভালবাসার ছায়ায় থাকিয়াও হৃদয়ে সম্পূর্ণ সুখ-শান্তি লাভ করিতে পারে নাই, তাহার কারণ ছিল গোঁসাই-মার অনাদর ও অবহেলা। আজকাল সে মায়ের প্রকৃত আদর ও যত্ন উপভোগ করিয়া সুখী হইল। এতদিন পরে সে আবার প্রাণ খুলিয়া হাসিবার সময় ও সুবিধা পাইল।

ভুবন বণিক গোঁসাই প্রভুর অন্যতম যুবক শিষ্য। তাহার স্ত্রী-বিয়োগের পর হইতে সে তাহার সঞ্চিত ধনসহ গোঁসাই বাড়ী আশ্রয় লইয়াছে। তাহার আত্মীয়-স্বজন কেহ ছিল না। গুরুপাট তীর্থক্ষেত্র, সুতরাং পুনরায় দার-পরিগ্রহ না করিয়া বাকী জীবনটা এই পবিত্র তীর্থে কাটাইতে সে মনস্থ করিয়াছে।

গোঁসাই প্রভু যেমন সকল শিষ্য ও শিষ্যাগণ হইতে রাধারাণীর প্রতি অধিক অনুরক্ত, তদনুরূপ গোঁসাই-পত্নীও

সকল শিষ্য ও শিষ্যাগণ হইতে এই ভুবন বণিকের প্রতি অধিক অনুরক্তা ছিলেন। ভুবনের শত দোষ তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। ভুবন যেদিন কোন কারণে তাঁহার পদসেবা, স্নানের পূর্ব্বে মস্তকে তৈল মর্দ্দন, গরমের সময় তালপত্রের পাখা দ্বারা বাতাস প্রদান, এবং তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ না করিত, সেইদিন তাঁহার কিছুই ভাল লাগিত না। সেইদিন তাঁহার মেজাজ আরো খিট্‌খিটে হইয়া পড়িত। যাকে তাকে অনর্থক গালাগালি করিতেন। ভুবনও গোঁসাই পত্নীর মনস্তুষ্টি করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত।

আজ অমাবস্যা নিশি। সন্ধ্যার পর হইতেই ঘন কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারে গোঁসাই বাড়ীর চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। তাহাতে আবার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দুই এক ফোঁটা করিয়া বৃষ্টিও পড়িতেছে। পবনদেব চতুর্দ্দিকে তাঁহার প্রবল প্রতাপ প্রকাশ করিতেছেন। বাতাসের তাণ্ডব নৃত্যে গোঁসাই বাড়ীর প্রত্যেক ঘরের জানালা-কপাটগুলি ঠাঁশ ঠাঁশ শব্দ করিতেছে। বাড়ীর সকলেই নৈশাহার সম্পন্ন করিয়া নিজ নিজ শয্যা গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই দুর্য্যোগের সময় ভুবন বণিক তাহার শয্যার এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে কি চিন্তা করিতেছিল। বাহিরের দুর্য্যোগের দিকে তাহার মন একেবারেই আকৃষ্ট করিয়াছিল না। এই সময় গোঁসাই-পত্নী

তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল, "তাহারা কখন আসবে ?"

ভুবন একটুকু হাসির সহিত উত্তর করিল, "এত চিন্তা কেন মা-ঠাকরুণ ? রাত-দুপুরের পরে আসবে বলেছে।"

গো-পত্নী। সত্য কথা তো ভুবন ? এ সময় আমার সঙ্গে পরিহাস ক'রো না।

ভুবন। আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকুন। ভুবন যে কাজে লাগে, তাহা সিদ্ধ না ক'রে ছাড়ে না জান্‌বেন।

গো-পত্নী! কত টাকা ফেরত আন্‌তে পেরেছ ?

ভুবন। এক পয়সাও নয়। বরং আশ্বাস দিয়ে এসেছি যে, ভালমত কাজ হাসিল হ'লে বক্‌শিস্ মিলবে।

গো-পত্নী। বক্‌শিসের কথা ব'লে ভালই করেছ। এখন সকাল-সকাল রাত্রির খাওয়া-দাওয়ার লেঠা ভেঙ্গে ঘুমাওগে।

ইহা বলিয়া গোঁসাই-পত্নী তাঁহার নিজ প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেলেন।

রজনী পূর্ণ-যৌবনত্বে পৌঁছিয়াছে—এখন রাত দ্বিপ্রহর। অন্যদিনের রাত্রি হইলে এখন সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ থাকিত ; কিন্তু আজ প্রচণ্ড বাতাসের শোঁ শোঁ আর অবিরাম বারিপাতের ঝর্-ঝর্ শব্দে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইয়া একটা বিকট মিশ্র গর্জ্জন সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা ব্যতীত এই দুর্য্যোগের মধ্যেও শৃগাল-কুকুরগণ সময় সময় চীৎকার করিয়া

সেই উন্মত্তা রজনীকে আরো অশান্তা ও উন্মাদিনী করিয়া তুলিয়াছে।

গোঁসাই বাড়ীর সকলেই এইসময় নিদ্রিত। কেবল গোঁসাই-পত্নীর চোখে তখনও ঘুম ছিল না। তিনি যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি এই প্রলয়ঙ্করী রজনীকে আরো প্রলঙ্করীর বেশে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন।

গোঁসাই বাড়ীতে একটি বৃদ্ধা শিষ্যা ছিল, তাহাকে সকলে "মনার মা" বলিয়া সম্বোধন করিত। রাধারাণী এই বৃদ্ধাকে মাসীমা বলিয়া ডাকিত। বৃদ্ধা, রাধারাণীকে নিজ কন্যার ন্যায় ভালবাসিত। এই গোস্বামী পরীতে রাধারাণীর পক্ষে এক গোঁসাই প্রভু, আর এই বৃদ্ধা ছাড়া আপনার জন আর কেহ ছিল না।

মনার মা রাধারাণীকে নিয়া ভিন্ন ঘরে শয়ন করিত। আজিও তাহারা তুইজনে অন্য দিনের মত নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছিল। এইসময় কিসের শব্দে বৃদ্ধার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বৃদ্ধা সেই ঘন অন্ধকারে কিছুই বুঝিতে পারিল না। মনে করিল, বোধ হয় পুষী বিড়ালটা বেড়া ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। কারণ, বাহিরে এই তুর্য্যোগের মধ্যে কোথাও যে দাঁড়াইবার স্থান নাই। বৃদ্ধা আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

কিছুকাল পরে গোঁ গোঁ শব্দে বৃদ্ধা আবার জাগিয়া উঠিল।

তখন বিদ্যুতালোকে দেখিতে পাইল, দুইটা বলিষ্ঠ দস্যু রাধারাণীকে দৃঢ়ভাবে উত্তোলন করিয়া ঘর হইতে বাহির হইতেছে। অন্য একজন দস্যু প্রকাণ্ড একটা লগুড়-হস্তে দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রাধারাণীর মুখ-বিবর যেন বস্ত্রগোলকে বদ্ধ, তাই সে কেবল গোঁ গোঁ শব্দ ব্যতীত আর কিছুই প্রকাশ করিতে সমর্থা হইতেছে না। বৃদ্ধা চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার চীৎকার শুনিয়া বাড়ীর পুরুষ ও মেয়েরা সকলে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন দস্যুগণ রাধারাণীকে স্কন্ধে করিয়া বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। বাড়ীর কতিপয় পুরুষ আলো হস্তে কতকদূর পর্য্যন্ত দস্যু-দিগের অনুসরণ করিল, কিন্তু সেই দুর্য্যোগের মধ্যে তাহারা রাধারাণীর কোন সন্ধান করিতে না পারিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। গোঁসাই-পত্নী ক্রন্দনের সুরে হায়! হায়! করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষের কোণে একবিন্দু অশ্রুও সেই দীপালোকে কেহ দেখিল না। তখন প্রায় সকলের হাতেই আলো ছিল। বৃদ্ধা মনার মার উচ্চ করুণ ক্রন্দনধ্বনি প্রচণ্ড বায়ু-নিশ্বনের সঙ্গে মিশিয়া একটা তুমুল কোলাহল সৃষ্টি করিতেছিল। বাড়ীর অন্যান্য নরনারীগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত মাথায় হাত দিয়া বাকী রাত্রিটুকু কোনপ্রকারে কাটাইল।

১১

গোঁসাই বাড়ীর উৎসবাদি পূর্ব্বে যে ভাবে চলিতেছিল, রাধারাণীর অপহরণের পরে তাহা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যে 'কিশোরী ভোজনোৎসব' প্রতি সপ্তাহে একবার মাত্র হইত, তাহা গোঁসাই-পত্নী এখন সশিষ্যে প্রত্যহ সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। বাড়ীর প্রায় সকলের মনেই যেন একটা সন্তোষের প্রবাহ বহিতে লাগিল। এইরূপ আনন্দে গা ঢালিয়া দিতে পারিল না কেবল বাড়ীর একজন, সে সেই বৃদ্ধা শিষ্যা 'মনার মা'।

মনার মা রাধারাণীর জন্য দিন রাত অশ্রু ত্যাগ করিত। তাহার একমাত্র পুত্র 'মনার' মৃত্যুর পর হইতে এই বৃদ্ধা বিধবা তাহার সমস্ত সম্বল লইয়া গোঁসাই বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সে তাহার পুত্রশোকে যতদূর কষ্ট পাইয়াছিল, দস্যুগণ কর্ত্তৃক রাধারাণী অপহরণে সে সেইরূপ মনঃকষ্ট ভোগ করিতেছিল। সে রাধারাণীর প্রতি গোঁসাই-পত্নীর আন্তরিক হিংসা অনেকদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছিল, তাই মুখ ফুটিয়া উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করিতে সাহস পাইত না; তবু রাধারাণীর অনুসন্ধান করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইতে গোঁসাই-পত্নীর পা জড়াইয়া ধরিয়া অনেকবার বলিয়াছিল, কিন্তু তাহার এই ব্যর্থ প্রয়াসে গোঁসাই-পত্নী ক্রোধিতা ফণিনীর

ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিত। রাধারাণীর প্রভুত্ব দর্শন করিয়া যে সব শিষ্য ও শিষ্যাগণ এতদিন হিংসায় জর্জ্জরিত হইয়াছিল, এখন তাহারা আপদ দূর হইল বলিয়া মনে মনে অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। এখন হইতে গোঁসাই-পত্নীকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল দেখাইতে লাগিল।

পাড়াপ্রতিবেশীদিগের মধ্যে কেহ কেহ আসিয়া গোঁসাই-পত্নীকে বলিল, "ওগো মা-ঠাকরুণ, একেবারে যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে রয়েছেন? এই যে বয়স্থা মেয়েটাকে দস্যুরা লুটে নিয়ে গেল, ইহার কি কিছু চেষ্টা ফিকির করতে হয় না?"

গোঁসাই-পত্নী মুখ ভার করিয়া উত্তর করিলেন, "এ তো কোন বেরাম-সেরাম নয় যে ওঝা-বৈদ্যি এনে চেষ্টা-ফিকির করবো। সকল গোষ্ঠী মিলে দস্যিদিগের পিছু পিছু গিয়েও তো কিছুই করতে পারলেম না। আমার এই মনের দারুণ কষ্ট রাখবার স্থান পাচ্ছি না যে, তোমরা এত চালাক-চতুর হ'য়েও ভিতরকার খবর কিছুই রাখছ না। এই বিধবা ছুঁড়িটার স্বভাব-চরিত্র ভাল হ'লে কি আর অমনি ক'রে পরপুরুষ এসে ওর গায়ে হাত দিতে সাহস করতো? এ বাড়ীতে তো আরো কত মেয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে কেউকে তো অমনি ক'রে দস্যিগণ বুকের মধ্যে জড়ায়ে ধ'রে নিয়ে যেতে সাহস পায় নাই।"

কোন প্রতিবেশিনী বলিল, "আর কিছু করুন বা না

করুন, লোক পাঠায়ে থানায় একটা এজাহার দেওয়াও তো দরকার।"

গোঁসাই-পত্নী উত্তর করিলেন, "তা কেমন ক'রে হয় দিদি? আমি মেয়েমানুষ বৈ তো নই। থানা-থুনা, এজাহার-টেজাহারের কথা কি বুঝব বল? থানায় খবর দিলে কিসে কি হ'য়ে পড়ে ঠিক কি। গ্রামবাসিগণ চোরকে ধরায়ে না দিলে অথবা পুলিশের সাহায্য না করলে চোর ধরতে পুলিশের যথেষ্ট বেগ পে'তে হয়। কোন কোন ঘটনায় পুলিশ এসেই প্রথমতঃ চুরিটাকে সন্দেহের চোখে দেখে। তারপর গৃহস্বামী চুরি সম্বন্ধে ভাল প্রমাণাদি দেখালে তবে সন্দেহ দূর হয়। আমাদের হ'য়েছে সোমত্ত মেয়ে চুরি, এটা তো সন্দেহের চোখে দেখবারই কথা। এজাহার পাঠালেই পুলিশ এসে আমার জবানবন্দী নিবে। জবানবন্দী দিবার জন্য অত বড় একটা দারোগার কাছে লজ্জা-সরম ত্যাগ ক'রে দাঁড়ায়ে কি আমার মান-ইজ্জৎ সব নষ্ট ক'রে ফেলব? তাই ভেবেছি, কর্ত্তাই তো শিষ্য-বাড়ী হ'তে শীগ্‌গির ফিরে আস্‌ছেন, যা করবার হয় তিনিই করবেন।"

গোঁসাই-পত্নীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া অন্য প্রতি-বেশিনী বলিল, "তাইতো মা-ঠাকরুণ, একে তো সোমত্ত মেয়ে, তাতে আবার বিধবা। স্বভাব-চরিত্র কি ক'রে ভাল রাখবে? তাই পরপুরুষের সঙ্গে রাত-দুপুরের সময় বের হ'য়ে চলে

গিয়েছে। ওদের মধ্যে আগেই যে গোপন পরামর্শ ছিল তার কোন ভুল নাই। বামুণের বাড়ী, ইহা নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া করাও বিপদ। আমাদের সমাজ তো দেখতেই পাচ্ছি। সমাজ তো নয়, যেন আস্ত একটা নেকড়ে বাঘ। একবার কারো একটা দোষ ধরতে পারলেই খেয়ে ফেলতে চায়।"

এই রমণীর কথাগুলি গোঁসাই-পত্নীর কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ করিল। তিনি অমনি এক শিষ্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "কোথায় গো কৃষ্ণভামিনী, শীগ্‌গির ক'রে এদের হাতে দুটো ক'রে পান তৈয়ের ক'রে এনে দে মা।"

প্রতিবেশিনীগণ মনের কথা মনে চাপিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে স্বীয় স্বীয় আলয়ে চলিয়া গেল।

রাধারাণী হরণের সাতদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। আজ অষ্টম দিনের প্রভাত। তপনদেব যদিও এখনো পূর্ব্বাকাশে দেখা দেন নাই, তত্রাচ দিঙ্‌মণ্ডল কতকটা আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সব চেয়ে বেশী পরিষ্কার দেখাইতেছে পূর্ব্বদিকটা। গোঁসাই পরিবারের কেহ কেহ এইসময় শয্যাত্যাগ করিয়া উঠানে গোবরছড়া দিতেছে ; এবং কেহ কেহ অন্যান্য গহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। গোঁসাই-পত্নী এইমাত্র নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম জপ করিতেছেন। এমন সময় জনৈক প্রতিবাসী আসিয়া ডাকিয়া বলিল, "কোথা গো গোঁসাই মা, শীগ্‌গির

ক'রে চলে এসে দেখুন গে, আপনাদের পুকুরের পূবধারে আমলকী তলায় মাথায় হাত দিয়ে ব'সে আপনাদের রাধারাণী কাঁদছে। আহা! হতভাগীর চেহারা এত খারাপ হ'য়ে গিয়েছে যে দেখ্‌লে সহসা চিন্‌তে পারা যাচ্ছে না।"

আগন্তুক অভয় হালদারের কথায় বাড়ীর সকলেই কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পুকুর পারের দিকে ছুটিয়া গেল। গেল না কেবল গোঁসাই-পত্নী। জনৈক বৃদ্ধ শিষ্য তাঁহাকে তথায় নিবার জন্য আসিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোদের ইচ্ছা হ'লে তোরা যেয়ে ঐ বেটীর কাছে পড়ে থাক। এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে ভগবানের নাম করছি। ইহা ছাড়া তপ, জপ, আহ্নিক সবই তো পড়ে রয়েছে। আমি কি এখন ঐ কুলটা মাগীর জন্য আমার ধর্ম্মকর্ম্ম সব নষ্ট করবো?"

যাহারা রাধারাণীর নিকট উপস্থিত ছিল, তাহারা তাহাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া ত্যক্ত করিয়া তুলিল। রাধারাণীর শরীর এত দুর্ব্বল ছিল যে, সে সকলের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। সে কেবল ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। তাহার লজ্জা-সরম ও দুর্ব্বলতা দর্শন করিয়া কেহ তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। তবু রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে যতটুকু বলিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাতে উপস্থিত সকলে বুঝিল যে, রাধারাণীর নিদ্রাবস্থায় তিনজন মুসলমান গুণ্ডা তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে স্কন্ধোপরি উত্তোলন করতঃ লইয়া গিয়াছিল। তাহার মুখবিবরে এতগুলি কাপড় ঢুকায়ে

দিয়াছিল যে, তজ্জন্য সে গোঁ গোঁ শব্দ ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিয়াছিল না। ইহা ব্যতীত একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা তাহার চক্ষুদ্বয় এমনভাবে তাড়াতাড়ি বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল যে, তজ্জন্য সে কিছুই দেখিতে পায় নাই। দস্যুদিগের স্কন্ধোপরি সাধ্যানুসারে সে যথেষ্ট ধস্তাধস্তি করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের দৃঢ় হস্তের কঠিন বন্ধনে সে কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। পথিমধ্যে অদূরে ক্ষণকালের জন্য মনুষ্য কোলাহলের শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, তন্মধ্যে তাহার পরিচিত কণ্ঠস্বরে সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহার উদ্ধারের জন্য লোক আসিতেছে। কিন্তু আবার সেই কোলাহল যতই দূর হইতে দূরান্তরে শ্রুত হইতে লাগিল, ততই তাহার মুক্তির আশাও নির্ম্মূল হইতে লাগিল। দস্যুগণ কোথায় যে তাকে লইয়া যাইতেছে তাহা সে বুঝিতে পারিল না। কতক্ষণ ধস্তাধস্তির পর সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। যখন তাহার জ্ঞান হইয়াছিল তখন সে দেখিতে পাইল একটা পরিত্যক্ত (পরুয়া) বাড়ীতে সে মৃত্তিকায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার অজ্ঞান অবস্থায়ই পাষণ্ডগণ তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ঘরের দ্বার বাহির হইতে বন্ধ করিয়াছে। বেলা যখন একপ্রহর, সেইসময় সে চৈতন্য-লাভ করিয়াছিল। সেই দস্যুদিগকে সে দেখিলে চিনিতে পারিবে। কারণ, ক্রমান্বয়ে সাতদিন পর্য্যন্ত তাহারা সময় সময় আসিয়া তাহার উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়া চলিয়া

গিয়াছে। সে তাহাদের পা ধরিয়া কত কাকুতি-মিনতি করিয়া মুক্তির জন্য আকুল প্রার্থনা জানাইয়াছে, তবু তাহাদের পাষাণ-হৃদয় দ্রবীভূত হয় নাই। চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কিম্বা উচ্চস্বরে কথা বলিতেও পারে নাই, কারণ দস্যুগণের হস্তে সর্ব্বদাই শাণিত ছুরিকা থাকিত, তাহা দ্বারা ভয় প্রদর্শন করিয়া বলিত, চেঁচাইলেই কাটিয়া ফেলিবে।

তিনদিন পর্য্যন্ত সে যবন প্রদত্ত কোন খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করে নাই। অনাহারে সে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিল। চতুর্থদিন হইতে তাহার মনে হইত, পাষণ্ডগণ সময় সময় ঝিনুক দ্বারা অজ্ঞান অবস্থায় তাহাকে কিছু কিছু উষ্ণ দুগ্ধ সেবন করাইতেছে। বোধ হয় তজ্জন্যই এ পর্য্যন্ত তাহার মৃত্যু হয় নাই। গত পরশ্ব দস্যুদিগের মধ্যে এক দস্যু জোর করিয়া তাহার মুখে অন্ন প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করে, আর মুসলমানী হইবার জন্য নানাপ্রকার প্রলোভন দেখায়; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

একদিন দস্যুগণ একজন মোল্লাকে আনিয়া উপস্থিত করে এবং তাহাদের মধ্যে একজনের নিকট রাধারাণীকে নিকা করিতে বারম্বার অনুরোধ করে। রাধারাণী কোনমতেই এই জঘন্য প্রস্তাবে রাজী হয় নাই। তাহার ক্রন্দনে ও কাকুতি-মিনতিতে মোল্লার কঠিন হৃদয়ে যেন একটুকু দয়ার সঞ্চার হইল। সে ঐ পাষণ্ড তিনজনকে যথেষ্ট ভৎসনা ও নানাবিধ ভয়প্রদর্শন করিতে লাগিল। অবশেষে চুপে চুপে কি

পরামর্শ দিয়া চলিয়া গেল। বোধ হয় তাহার ঐ তিরস্কার ও পরামর্শের ফলেই পাষণ্ডগণ নিরুপায় দেখিয়া পূর্ব্বের মত রাধারাণীর চক্ষুর্দ্বয় ও মুখ কাপড় দ্বারা দৃঢ়ভাবে বান্ধিয়া আজ ভোরের সময় এখানে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে। সে সেই নির্জ্জন পতিত বাড়ীতে এই সাত দিনের ভিতর কোন স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করে নাই।

যাহারা রাধারাণীর করুণ কাহিনী শ্রবণ করিল, তাহারা সকলেই অশ্রুত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারিল না। কেহ কেহ এত উত্তেজিত হইয়া উঠিল যে, তাহাদের মুখচ্ছবিতে প্রতিহিংসার প্রতিবিম্ব প্রকটিত হইতে দেখা গেল। কিন্তু গোঁসাই-পত্নী লোক দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, "খবরদার, ঐ কুলটা, জাতিভ্রষ্টা, নচ্ছার মাগীটাকে কেহ যেন তাহার বাড়ীতে না নিয়া আসে। উহার গায়ের গন্ধে গোবিন্দজী অশুচি হ'য়ে পড়বেন। আর সেই দুশ্চরিত্রা যদি নিজেই এসে এ বাড়ীতে পা দেয়, তবে তাকে খেঙ্‌রা মেরে তাড়ায়ে দিব।"

গোঁসাই-পত্নীর এইরূপ দারুণ আদেশ শুনিয়া রাধারাণী সাধ্যানুসারে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অতঃপর সে গোঁসাই-পত্নীর চরণধূলি গ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিল, কিন্তু তাহাও গোঁসাই-পত্নী নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। এইভাবে বেলা অনেক হইয়া গেল। ক্রমে পাড়ার লোক-গুলিও দস্যু এবং গোঁসাই-পত্নীর কার্য্যের সমালোচনা করিতে করিতে নিজ নিজ আলয়ে চলিয়া গেল। কেবল গেল না

সেই বৃদ্ধা মনার মা। সে এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছিল। যখন সে দেখিল সকলেই যার-যার বাড়ী চলিয়া গেল; কেহই রাধারাণীকে একটুকু স্থান দিতে সাহস পাইল না, তখন সে চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "চল্ রাধা আমার সাথে। তোর বাপের্ ভিটিতে তোকে রেখে আসি-গে।"

উপেক্ষিতা রাধারাণী অগত্যা মনার মার সঙ্গে পিত্রালয়াভিমুখে রওনা হইল। গোঁসাই-পত্নীর নির্ঘাত বাণীগুলি তাহার কর্ণবিবরে তখনও অশনিপাতের ন্যায় বাজিতেছিল। ব্যর্থ অশ্রুপাতের চিহ্নগুলি তখনও তাহার কপোলে রৌদ্র-রক্ত-দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিতেছিল।

তাহারা যখন ঈশ্বর মণ্ডলের বাড়ী পৌঁছিল তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। রাধারাণী সমস্ত ঘটনাগুলি তাহার পিসীমার নিকট বর্ণনা করিয়া একটুকু আশ্রয় প্রার্থনা করিল। রাধারাণীর বিশ্বাস ছিল যে, তাহার পিসীমা কখনো তাহাকে পায়ে ঠেলিবে না। সে নিশ্চয়ই কোলে তুলিয়া লইবে। তাই সে কোন কথা গোপন করিল না। কিন্তু হতভাগিনীর শত প্রার্থনায় এবং মনার মার শত অনুরোধেও পিসীমার পাষাণ-হৃদয় দ্রবীভূত হইল না।

পিসীমা বলিল, "ওমা তাও কি হয়? আমি থাকি পরের বাড়ী। আমি থাকি সমাজ নিয়া গ্রামের দশজনের সঙ্গে। গোঁসাই মা যখন তোকে স্থান দিতে সাহস পান নাই, তখন কি ক'রে তোকে আমার কাছে রেখে 'একঘরে' হ'য়ে থাক্‌ব?

ধোপা, নাপিত, পুরুত সবই বন্ধ হয়ে যাবে। আমারও হাতের জল অশুদ্ধ বলে কেহ আমাকে স্পর্শ করবে না। তুলসীতলায় জল ঢালবার অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে পড়বো। আর হরিদাস, জানই তো সে দেবতাভক্ত। সর্ব্বদা পবিত্র থাকতে ভালবাসে। যার জাত নষ্ট হয়েছে এইরূপ কোন লোককে বাড়ীতে স্থান দিলে সে বাড়ী আসিয়া আগে আমাকেই তাড়াবে। আজ তো রাত হয়েছে, কোথায়ও যাবার যো নেই, তাই বল্‌ছি তোরা দুজনে যেয়ে বাহির বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরের এক কোণে আঁচল পেতে শুয়ে থাক্‌গে। কাল খুব ভোরে উঠে শ্বশুরবাড়ী চলে যাস্‌। সেই ঠাঁই তোর হচ্ছে আসল ঠাঁই। সেটা হয়েছে তোর নিজের বাড়ী আর এটা হয়েছে তোর ভাইর বাড়ী। সেখানে দাবী-দাওয়া সবই চল্‌বে।”

রাধারাণী কাঁদিয়া বলিল, “এটাও কি আমার নিজের বাড়ী নয় পিসীমা? বাপের বাড়ীকে কি কেহ কখনো পরের বাড়ী জ্ঞান করে? আর তুমিও কি আমার কপাল-দোষে আজ পর হয়ে পড়লে?”

পিসীমা উত্তর করিল, “ষাট বাছা আমার! তুই আমার পর হবি কেন? তোকে কোলে ক'রে মানুষ করেছি। পাঁচ বছরের শিশু রেখে তোর মা যখন মারা যায়, তখন হতেই তো তোকে পেলেছিলেম। তোর মার অভাব তোকে জান্‌তে দেই নাই। তবে কথাটা কি জানিস্‌ রাধি, তোর দাদা

হরিদাস খুব গুরুভক্ত। গুরুমার নির্ঘাত বাণীগুলি তো শুনে এসেছিস্? সেই গুরুমা যখন তোকে স্থান দেন নাই, তখন হরিদাসও তোকে স্থান দিবে না। সকলেই সমাজটাকে বড় ভয় করে, তাই আমিও ভয় করি। এখন কয়েকটা দিন শ্বশুরবাড়ী যেয়ে থাক্। হরিদাস বাড়ী আস্‌লেই তাকে ব'লে ক'য়ে তোকে প্রায়শ্চিত্ত করায়ে আবার এখানে আনবো। তুই কষ্টে-শিষ্টে আর কয়টা দিন সেখানে কাটা-গে।"

রাধারাণী কাতরকণ্ঠে বলিল, "না পিসীমা, সেখানেও তাঁরা আমাকে গছবে না। যাঁরা এই হতভাগিনীকে জন্মের মত বিদায় ক'রে দিয়েছেন, তাঁরা কেন আবার আমাকে স্থান দিবেন? আর এর মধ্যেই যদি সেখানে আমার কলঙ্কের কথা পৌঁছে থাকে, তবে তো আশা-ভরসা সবই চিরকালের জন্য নির্ম্মূল হ'য়ে রয়েছে।"

ইহা বলিয়া রাধারাণী কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই পিসীমার দয়া হইল না। তাহার যে ধোপা, নাপিত, পুরোহিত বন্ধ হয়ে তাহাকে সমাজে 'একঘরে' করিয়া ফেলিবে সেই কথাই রাধারাণীকে বারম্বার শুনাইতে লাগিল। সে দৃঢ়ভাবে জানাইল যে, তাহার শেষকালে সে এত সামাজিক বিড়ম্বনা সহ্য করিতে পারিবে না।

পিসীমা জপের থলীর ভিতর মালা টপ্ টপ্ করিয়া কৃষ্ণনাম জপিতে লাগিল। আর রাধারাণী তাহার এত

আদরের পিত্রালয়েও উপেক্ষিতা হইয়া বাহির বাড়ীর এক ঘরে মনার মাকে নিয়া সমস্ত রাত্রিখানা নানা ভাবনা-চিন্তার মধ্যে কোনক্রমে কাটাইল।

অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া রাধারাণী মনার মার সঙ্গে সেই গ্রামের অনেকের নিকট যাইয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিল। এমন কি, যে যদু ঠাকুরের নামে সে ভয় পাইত, সেই যদু ঠাকুরের বাড়ীতেও যাইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিল, কিন্তু সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে কেহই রাধারাণীকে আশ্রয় দিতে সাহস পাইল না। অতঃপর তাহারা দুইজনে বেলা দুই প্রহরের সময় রাধারাণীর শ্বশুরবাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষুৎপিপাসায় দুইজনের শরীরই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। দীর্ঘ একটা ঘোমটা টানিয়া রাধারাণী মৃদুস্বরে কাঁদিতেছিল।

মনার মা, রাধারাণীর শাশুড়ীকে সম্মুখে পাইয়া বলিল, "এই নাও গো গিন্নীমা তোমার বড় বউকে। কোন-দিন বাপের বাড়ী পার ক'রে রেখে এসেছ, তারপর আর খোঁজখবর নেই। সেখানে ওকে দেখবার তো আজকাল কেউ নেই। বাপ, ভাই যে কোথায় চলে গিয়েছেন কেহ তাঁদের খবরও বল্‌তে পারে না।"

শাশুড়ী, অবগুণ্ঠনবতী বধূকে দেখিয়াই তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। বধূকে যে গুণ্ডারা ধরিয়া নিয়া উহার জাত নষ্ট করিয়া দিয়াছে, আর উহার উপর পাশবিক অত্যাচার

করিতেও যে তাহারা ছাড়ে নাই এইরূপ অনেক দুর্নাম ইতিমধ্যে একজন অপরিচিত লোক আসিয়া তাহাদিগকে শুনাইয়া গিয়াছে। এখন বধূকে সম্মুখে দেখিয়া গর্জ্জিয়া বলিল, "হাঁ গো হাঁ, আমরা সবই জান্‌তে পেরেছি। এই তো অল্লক্ষণ হ'ল একটা লোক এসে নচ্ছার বউর কীর্ত্তি-কাহিনী সবই বলে গেল। জাতনাশা, দুশ্চরিত্রা বউকে কে কবে ঘরে জায়গা দিয়েছে বল্ দেখি? দূর হ' বেটীরা। আমাদের বড় বউ অনেকদিন হয় মরে গিয়েছে। আজ আবার কোথা হ'তে একটা জাতনাশা মাগীকে ধরে নিয়ে এসেছে গা। বেটী নিজের জাত নষ্ট ক'রে আবার আমাদের জাতটাও নষ্ট করতে এ বাড়ীতে জায়গা নিতে চাচ্ছে। দেখ দেখি মাগীর সাহসটা কত বড়। আবার বল্‌ছি, দূর্ হ বেটীরা. নতুবা ঝাঁটা-পেটা ক'রে তাড়ায়ে দিব।"

রাধারাণী এবার পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিল যে, এইভাবেই চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইয়া তাহার আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী তাহার কলঙ্ক রটনা করা গোঁসাই-পত্নীর কাজ ছাড়া অন্য কেহর কাজ নয়। এতদিনে সে তাহার ভীষণ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে সে অবকাশ পাইয়াছে। ইহা সকলই তাহার অদৃষ্টের পরিহাস!

এইরূপ স্থানে স্থানে উপেক্ষিতা ও অপমানিতা হইয়া রাধারাণী অবশেষে সেইদিনই, রাত্রি দুই প্রহরের সময় মনার মার নিজ বাড়ীতে উপস্থিত হইল। বৃদ্ধার কেহ ছিল না।

পুত্রের মৃত্যুর পরে ঘর-দরজা বন্ধ করিয়া পুঁজিপাট্টা যা কিছু ছিল সবসহ গোঁসাই বাড়ী যাইয়া পড়িয়া রহিয়াছিল। তিন কি চার মাস পর একবার আসিয়া বাড়ী-ঘর দেখিয়া যাইত।

মনার মা ঘরের দরজা খুলিয়া দেখিল, ঘরখানা ছুঁচো, আরসুলা ও মাকড়সাতে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে উলু মাটীর স্তূপ। চতুর্দ্দিকে দুর্গন্ধ। এত অধিক রাত্রিতে অনেক ডাকা-ডাকির পরে এক প্রতিবেশিনীকে জাগাইয়া তাহার নিকট হইতে আগুন সংগ্রহ করিল এবং খড়কুটা সংযোগে আলো জ্বালাইয়া সে দেখিল, ঘরের মধ্যে কতকগুলি চাউল ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। একটা মৃণ্ময় হাঁড়ির মধ্যে সে কয়েক সের চাউল রাখিয়া গিয়াছিল; তাহার অল্প কতক অংশ মাত্র হাঁড়িতে অবশিষ্ট রহিয়াছে। আর সবগুলিই ইন্দুর ও ছুঁচোয় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। যে একমুষ্টি চাউল ছিল তাহাই দুইজনে চিবাইয়া একটুকু জল পান করিল। শেষে ঘরের মেঝের উপর মাদুর পাতিয়া শয়ন করিয়া রহিল। সেইদিন হইতে রাধারাণী মনার মার পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিতে লাগিল। সে মাসীমা ছাড়া আর কিছু জানিত না। মাসীমার স্নেহ, রাধারাণীর সেবা-শুশ্রূষার গুণে, রাধারাণীর প্রতি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

রাধারাণী ধর্ষিতা হইয়াছে, মুসলমান গুণ্ডাগণ তাহার জাতিনষ্ট করিয়াছে, এইরূপ কতকগুলি অপবাদ মনার মার

গ্রামে কোন এক দুষ্ট লোক কর্ত্তৃক যথা সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল। একদা গ্রামের মাতব্বরগণ মনার মাকে ডাকাইয়া জানাইল যে হয় সে রাধারাণীকে পরিত্যাগ করুক নতুবা তাহারা দুইজনেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাউক। আর সেই গ্রামে বাস করিতে হইলে শাস্ত্রমত উভয়কেই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বাস করিতে হইবে। তাহা না করিলে মনার মার ধোপা, নাপিত, পুরোহিত সব বন্ধ করা হইবে। তাহার হাতের জলও কেহ স্পর্শ করিবে না।

মনার মা করযোড়ে জানাইল যেদিন তাহার একমাত্র পুত্র "মনার" মৃত্যু হইয়াছে সেইদিন হইতেই সে একরূপ মরিয়া রহিয়াছে; সুতরাং মৃতার আবার সমাজের ভয় কি? বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার ধোপা নাপিত বা পুরোহিতের কোন দরকার নাই। সে নিজের হাতে মলিন কাপড় কাচিয়া নিবে। বিধবার পক্ষে নাপিতের তো কোন আবশ্যকতাই নাই। তাহার বাড়ীতে কোন পূজা-ব্রত নাই যে পুরোহিতের জন্য তাহা ঠেকা থাকিবে। আর যদি কেহ তাহার হাতের জল স্পর্শ বা গ্রহণ না করে তাহাতেও তাহার কিছু আসে যাইবে না। তাহার মৃত্যুর পরে কেহ যদি তাহার মৃতদেহ সৎকার না করে আর উহা যদি শৃগাল কুক্কুর কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় তাতেও তাহার কোন ক্ষোভ হইবে না। রাধারাণী তাহার পালিতা কন্যা। তাহাকে সে শত নির্য্যাতনেও ত্যাগ করিতে পারিবে না।

তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত সে রাধারাণীকে তাহার নিজ বাড়ীতে স্থান দিয়া পালন করিবে।

মনার মার দৃঢ়তা দর্শন করিয়া সমাজপতিগণ এই সম্বন্ধে আর কোনরূপ পীড়াপীড়ি করা আবশ্যক মনে করিল না। তাহার পরদিন হইতে মনার মা'র ধোপা, নাপিত ও পুরোহিত বন্ধ হইয়া গেল। সুখের বিষয়, এই তিন শ্রেণীর লোকের কোন আবশ্যকতা সেই সময় মনার মার ছিল না। সমাজচ্যুতা মনার মা রাধারাণীকে নিয়া কায়ক্লেশে দিন কাটাইতে লাগিল।

১২

সে আজ পনেরো দিনের কথা। গত পূর্ণিমা তিথিতে প্রেমানন্দ স্বামী নামক জনৈক সাধু আসিয়া দ্বিপাড়া গ্রামে ঈশ্বর মণ্ডলের বাড়ীতে নব নির্ম্মিত সার্ব্বজনীন হিন্দু দেবালয়ে ঠাকুর গোবিন্দজীর বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন। সেখানে সকল হিন্দুর পক্ষেই অবারিত দ্বার। জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে তথায় সকল শ্রেণীর হিন্দুকে গোবিন্দজীর দৈনিক পূজায় যোগদান ও অঞ্জলি প্রদান করিতে দেওয়া হইতেছে। আর উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী ও দরিদ্র-নারায়ণগণ উদর ভরিয়া প্রসাদ

পাইয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে। এই কয়দিনের মধ্যেই সংবাদ-গুলি দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে। দূরস্থ কেহ কেহ ইহা বিশ্বাস করিতেছে, আবার কেহ কেহ উহা উন্মাদের কাণ্ড বলিয়া উপেক্ষা করিতেছে। আবার কেহ কেহ বলিতেছে, "এই যে দেখে এলেম, এক বেটা ভণ্ড বদমায়েস খোট্টাদের দেশ হ'তে সাধু সেজে এসে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগুলিকে নাচাচ্ছে, আর তাদিগকে কতকগুলি শাস্ত্র-বহির্ভূত ক্ষমতা দিয়ে সমাজটাকে একেবারে মাটী করে ফেলবার চেষ্টা কর্‌ছে। করুক না—এইরূপ বুজরুকী দু'দিনেই ভেঙ্গে যাবে।" যাহারা ভাল লোক তাহারা প্রেমানন্দ স্বামীর উদারতা ও কল্যাণকর কার্য্যাবলী অবলোকন করিয়া তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সাফল্যলাভের জন্য মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিতেছে।

এই সংবাদ ক্রমে রাধারাণী ও মনার মা'র কাণেও পৌঁছিল। রাস্তা-ঘাটে পুরুষ ও স্ত্রীগণের মধ্যে এ বিষয় লইয়া একটা বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি হইতেছে দেখিয়া একদা মনার মা রাধারাণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর বাবার নাম না ঈশ্বর মণ্ডল, রাধি ?"

রাধারাণী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "হাঁ মাসীমা, আমিও তাই ভাবছি। যে বাড়ীতে আমি একটু ঠাঁই পাই নাই, সেই খালি বাড়ীতে কি ক'রে একজন অপরিচিত লোক সাধু সেজে এসে গোবিন্দজীর বিগ্রহ স্থাপন করতে সমর্থ হ'ল ?"

মনার মা আস্বাসিতা হইয়া বলিল, "দ্বিপাড়া গ্রামে তুই

ঈশ্বর মণ্ডলের বাড়ী রয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। ঐ সব কাণ্ড তোর বাবার বাড়ীতেই হচ্ছে। আমার বিশ্বাস, তোর বাবাই কোন এক সাধুকে পশ্চিম দেশ হ'তে পাঠিয়ে দিয়েছেন, আর সেই সাধুই তোর বাবার বাড়ীতে বিগ্রহ স্থাপন করেছেন। তাও যদি না হয় আমাদের আর একবার সেখানে যেয়ে দেখে আস্‌তে দোষ কি? তাই বলছি, চল্ আমার সাথে। ঘটনা যদি সত্য হয়, তবে সাধুকে তোর পরিচয় প্রদান ক'রে তাঁর আশ্রমে থাকতে চেষ্টা করবো। হাতের টাকা-পয়সাগুলি তো ক্রমে ক্রমে সব ফুরিয়ে গেল। সেখানে যখন সকল শ্রেণীর হিন্দুরই ঠাঁই হচ্ছে, তখন আমাদের ঠাঁইও সেখানে হবে না কেন? শুনেছি, সমাজ যাকে ঠাঁই দেয় নাই, তাকেও নাকি বেশী আদর ক'রে সেখানে ঠাঁই দিচ্ছে। এখানকার সমাজে যদি ঠাঁই পেতেম, তবে নয়তো দু'জনে দুই বাড়ীতে ঝি'র কাজ করে দুটো পেট পুষতে পারতেম। সকলেই বল্‌ছে সাধুটি নাকি খুব দয়ালু।"

রাধারাণী বলিল, "বাপের বাড়ী যাব—একবার কেন, দশবারও যেতে পারি। তথায় আবারও উপেক্ষিতা হলে মনে বেশী কষ্টবোধ করব না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে উহা অন্য কোন ঈশ্বর মণ্ডলের বাড়ী। এক নামের একাধিক লোক প্রত্যেক গ্রামেই আছে। বাবা ও দাদা অনেক বৎসর যাবত নিরুদ্দেশ। জাতি যাওয়ার ভয়ে বৃদ্ধা পিসীমা যখন আমাকেই সেখানে স্থান দেন নাই, তখন আর একটি জাতনাশা

সাধুকে যে তিনি তথায় স্থান দিয়েছেন ইহা আমার সহজে বিশ্বাস হচ্ছে না।"

মনার মা আগ্রহসহকারে উত্তর করিল, "আমিও তো তাই বলছি রাধি। চল্ একবার নিজ চোখে দেখে আসিগে। দ্বিপাড়া গ্রামতো বেশী দূর নয়। এখান হতে মাত্র চারি ক্রোশের রাস্তা। কাল ভোরে ভাতেভাত দুটো পেটে গুজে যাওয়া যাবে, কারণ সেবারের মত যদি এবারও তথায় আমাদের ঠাঁই না হয় তবুতো ক্ষুধায় কষ্ট পাব না।"

রাধারাণী মনার মার প্রস্তাবে অগত্যা স্বীকৃতা হইল।

তাহারা যখন দ্বিপাড়া গ্রামে ঈশ্বর মণ্ডলের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল তখন বেলা প্রায় আড়াই প্রহর হইয়াছে। তপনদেব তখন মাথার উপর হইতে পশ্চিমদিকে কতক ঢলিয়া পড়িয়াছেন। তাহারা দেখিল রাধারাণীরই পিত্রালয়ে শত শত নরনারী জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে একত্র বসিয়া পংক্তি ভোজন করিতেছে। মহোৎসবের ন্যায় সমগ্র স্থানটা আনন্দে পরিপূর্ণ। এইসব ব্যাপার খুব মনোযোগের সহিত পর্যাবেক্ষণ করিতেছেন দুইজন সাধু। রাধারাণী দেখিয়াই চিনিতে পারিল উহার একজন তাহার পিতা, অন্যজন তাহার দাদা। সে আরো দেখিল তাহার দাদাকে উপস্থিত জনমণ্ডলী সাধু হরিদাস বলিয়া, আর তাহার পিতাকে মোহান্ত মহারাজ বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। দুই জনেরই পরিধানে গেরুয়া বসন। উভয়েরই মস্তক মুণ্ডিত। ললাটে পবিত্র চন্দনের

দীর্ঘ ফোঁটা। দুঃখ-কষ্টে নিপীড়িতা রাধারাণীর ক্ষুদ্র হৃদয়-টুকু তখন গর্ব্বে ও আনন্দে উচ্চ হইয়া উঠিল। এই দৈন্যের মধ্যেও তাহাকে সে পরম ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিল। তবু তাহার পিতা বা ভ্রাতার নিকট সহসা যাইতে সাহস হইল না। কারণ, সে যে ধর্ষিতা, পতিতা, জাতিভ্রষ্টা ও এইরূপ অনেক আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা। তাই বাহিরে অপেক্ষা করিয়া মনার মাকে আশ্রমের ভিতর পিতার নিকট পাঠাইয়া দিল।

তখন পংক্তি ভোজন শেষ হইয়া গিয়াছে। নর-নারায়ণ-গণ নিজ নিজ আবাসে চলিয়া গিয়াছে। আশ্রম নীরবতায় পূর্ণ হইয়াছে।

মনার মার কথাগুলি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া প্রেমানন্দ স্বামী ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "রাধারাণী? তাঁরই কন্যা রাধারাণীর এত দুর্দ্দশা? এযে সত্য বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছে না। একি তাঁর জাগ্রত দুঃস্বপ্ন। পুত্র হরিদাসের নিকট শুনেছি রাধি নাকি গুরুপাটে নির্ব্বিঘ্নে বাস করছে; তথায় তার প্রতিপত্তিও যথেষ্ট রয়েছে। সেই রাধিই কি ধর্ষিতা, জাতিভ্রষ্টা ও আশ্রয়হীনা? যে গোঁসাই পরিবার এতকাল হ'তে মণ্ডল বাড়ীর মোটা বার্ষিক-দানে পরিপুষ্ট, সেই পরিবার হ'তে তাঁরই কন্যা রাধারাণী পরিত্যক্তা। এতো সহজে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না। আর যদি

আগন্তুক রমণী তাঁহারই কন্যা রাধারাণী হয়ে থাকে, তবে সে শত ধর্ষিতা বা জাতিভ্রষ্টা হলেও কেন নিজ পিতার সম্মুখে উপস্থিত হ'তে তার সাহস হচ্ছে না। তাই বোধ হচ্ছে আগন্তুক রমণী তাহার নিজ কন্যা রাধারাণী নয়।"

সংসার-বিরাগী বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর চক্ষের কোণে জলবিম্ব দেখা গেল। রাধারাণীর শৈশবের কথা তখন তাঁহার স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠিল। সেই মাতৃহীনা পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকাকে কত কষ্টে তিনি লালনপালন করিয়াছিলেন। অবশেষে তাহার নির্ম্মম বৈধব্য বেশ আর সেই ঘোর অপ্রিয় বৈধব্য মূর্ত্তি-দর্শন সহ্য করিতে না পারিয়া শান্তির আশায় সংসার ত্যাগ করিয়া ভগবানোদ্দেশে পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছিলেন। আবার কোন এক যাদুমন্ত্রের পরিচালনে পুনরায় তাঁহাকে তাঁহার পরিত্যক্ত জন্মভূমিতে উপস্থিত হইতে হইয়াছে। সন্ন্যাসী দুই হস্তে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় চাপিয়া ধরিয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত দণ্ডয়মান রহিলেন।

মনার মা, প্রত্যুত্তরের জন্য প্রেমানন্দ স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু তাঁহার এরূপ বিমর্ষ ও নয়ন-কোণে জলবিম্ব আর হস্তদ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিতে দেখিয়া, সেও স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। কোন প্রশ্ন করিবার তাহার সাহস হইল না। সে মনে করিতে লাগিল, রাধারাণী ধর্ষণে স্বামীজীর আত্মসম্মান অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে

বলিয়াই বোধ হয় স্বামীজী অবশেষে চক্ষুর্দ্বয় হস্তদ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন।

কিছুকাল পরে প্রেমানন্দ স্বামী আত্ম-সংবরণ করিয়া পুত্র হরিদাসের নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বর্ণনা করিলেন। পুত্র হরিদাসও রাধারাণীর দুর্দ্দশার কথাগুলি শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল হতবুদ্ধির মত পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল, "চলুন পিতঃ, আমরা দুইজনেই আগন্তুক রমণীকে দেখে আসিগে। আমার বোধ হচ্ছে সে আমাদের রাধারাণী নয়।"

এই সময় গেরুয়া বসনধারী আশ্রমবাসী জনৈক পরিচারক সাধু আসিয়া বলিল, "দরিদ্র নারায়ণ সেবা ও অন্যান্য সকলের আহারাদি শেষ হয়েছে। আর কেউ যে অভুক্ত রয়েছেন তাহা জানা যায় নাই। এখন আপনাদের দুজনের সেবা হলেই আজকার দিনের কাজ একরূপ সম্পন্ন হয়ে যাবে। যে আজ্ঞা হয় করুন।"

সাধু হরিদাস বলিল, "না, এখনো আরো দুইজন অভুক্ত রয়েছে। তাদিগকে আনতে যাচ্ছি। তোমরা আরো কিছুকাল অপেক্ষা করগে।"

পরিচারক সাধু চলিয়া গেল।

মনার মাকে সঙ্গে করিয়া প্রেমানন্দ স্বামী ও সাধু হরিদাস আশ্রমের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, তাহাদেরই রাধারাণী একটা বৃক্ষতলে বসিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে।

পিতা ক্ষিপ্তের ন্যায় তনয়াকে বুকে তুলিয়া লইয়া সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাধারাণীর হৃদয় তখন শোকে কষ্টে এত প্রপীড়িত ছিল যে সে কতক্ষণ পর্য্যন্ত রোদন-রব ব্যতীত আর কোন শব্দ মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না।

সাধু হরিদাস বলিল, "কি আশ্চর্য্য! জাতনষ্ট ও সমাজ-ভ্রষ্ট হওয়ার ভয়ে আজ পর্য্যন্তও পিসীমা এইসব বৃত্তান্ত আমাদের নিকট গোপন রেখেছেন।"

প্রেমানন্দ স্বামী বাষ্পাকুল লোচনে রাধারাণীর দিকে চাহিয়া বলিল, "মা, তুই যে সব অত্যাচার ও নির্য্যাতন সহ্য করেছিস উহা তোর পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল মনে করে এখন সব ভুলে যা। সুখ দুঃখ, রোগ শোক, ধর্ষণ নির্য্যাতন সবই ভগবানের দান। উহা যে মানব বুক পেতে অহিংসক হয়ে গ্রহণ করতে পারে সেই প্রকৃত মানুষ। সুতরাং উহার জন্য তোর মনের মধ্যে কষ্ট টেনে আনা উচিত নয়। আর যে জন উহাতে কষ্ট জ্ঞান করে সে চিরকালই কষ্ট ভোগ করে। শান্তির মুখ দর্শন করা তার ভাগ্যে কখনো ঘটে না। আজ হ'তে তুই এই আশ্রমভুক্ত হয়ে দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ কর। আমি আশা করি, আমার সঙ্কল্পিত কার্য্যাবালীতে তোরই মত শত শত অসহায়া ও নির্য্যাতিতার উদ্যম সহায়তা পেয়ে আমার উৎসাহ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হবে।"

স্বামীজী মনার মাকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন, "মা,

তোমার ইতিহাস যা শুনলেম তাতে বুঝতে পেরেছি এ জগতে তুমি বন্ধন-শূন্য। এখন তোমার আপনা বলতে কেহ নাই। তাই তুমি গুরু-পাটে যেয়ে ভগবান গোবিন্দজীর চরণে আশ্রয় লয়েছিলে। আমার এই আশ্রমেও ঠাকুর গোবিন্দজী রয়েছেন। আজ হ'তে তুমিও তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হও। ভগবান গোবিন্দজীর দয়ায় আর তোমারই মত শত শত নর-নারীর সহায়তায় আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হ'বে।"

মনার মা এই অযাচিত প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিয়া সেই দিন হইতে রাধারাণী সহ আশ্রমভুক্ত হইয়া রহিল।

ইহার পরদিবস দ্বিগুণ উৎসাহে প্রেমানন্দ স্বামী ঢোল সরবরাহে গ্রামে গ্রামে প্রচার করাইল যে এখন হইতে তাঁহার সমস্ত বাড়ীখানা সার্ব্বজনীন হিন্দু আশ্রমে পরিণত হইল। যেখানেই ধর্ষিতা, নির্য্যাতিতা, উপেক্ষিতা, পতিতা বা জাতি-ভ্রষ্টা হিন্দু নারী থাকুক সকলেই এই উদার আশ্রমে চলিয়া আসুক। তাহারা জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে ঠাকুর গোবিন্দজীর আশ্রমে চিরদিন স্থান ও আহার পাইবে। এই আশ্রমে বাল-বিধবাদিগকে সুপাত্রে বিবাহ দিয়া আশ্রমেই রাখিবার চেষ্টা করা হইবে। আর জাতিভ্রষ্ট, সমাজচ্যুত ও অসমর্থ হিন্দু পুরুষ যে যেখানে থাকুক তাহারাও চলিয়া আসুক, তাহাদের জন্যও এই আশ্রমে ঠাঁই রহিয়াছে। ইহা ছাড়া অক্ষম, অন্ধ, আতুর ও অসহায় নর-নারীগণ প্রত্যহ ঠাকুর গোবিন্দজীর প্রসাদ দুই বেলাই পাইতে পারিবে।

এই বার্ত্তা গ্রামে গ্রামে ঘোষিত হইলে বহু নর-নারী দূর-দেশান্তর হইতে আশ্রমে আসিতে লাগিল। তজ্জন্য আশ্রমের আয়তন চতুর্গুণ বৃদ্ধি করা হইল। শত শত ঢেউ-টিনের কুটীর প্রস্তুত করা হইল। লোকসংখ্যা অনুসারে আরো কয়েকটী নূতন পুকুরও খনন করা হইল। আশ্রমের চতুর্দ্দিকস্থ কৃষি ক্ষেত্রগুলি মালিকদিগের নিকট হইতে উচিত মূল্য হইতেও অধিক মূল্যের প্রলোভন দেখাইয়া ক্রয় করা হইল। বাগান প্রস্তুত করিবার জন্য নিকটে কতকগুলি জমী গ্রহণ করা হইল।

বহু ধর্ষিতা নারী যাহারা শত চেষ্টায়ও সমাজে স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই; বহু পুরুষ যাহারা নানা কারণে নানা প্রকার সামাজিক লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছিল তাহারা দলে দলে আসিয়া ঠাকুর গোবিন্দজীর আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে সকল শ্রেণীর হিন্দুই ছিল। মথুরায় সার্ব্বজনীন হিন্দু আশ্রম হইতে ভক্ত নিত্যানন্দ সময় সময় প্রচুর পরিমাণে অর্থ পাঠাইতে লাগিল। আশ্রমস্থ ধোপাগণ কাপড় কাচার কাজ, নাপিতগণ ক্ষৌরীর কাজ, কুম্ভকারগণ তাহাদের জাত-ব্যবসা মৃণ্ময় হাঁড়ি, ঘট, কলসী ইত্যাদি নির্ম্মাণের কাজ ব্যতীত নিকটস্থ কৃষিক্ষেত্রে যাইয়া অবসর মত কৃষিকাজ করিতে লাগিল। যে অল্পসংখ্যক সমাজচ্যুত ব্রাহ্মণ আশ্রমভুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারাও পূজা আহ্নিকের কাজ ছাড়া কৃষি কাজে মনোনিবেশ করিলেন।

আশ্রমস্থ বালক বালিকাদিগের জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। আশ্রমের কাজ এইভাবে চলিতে লাগিল যে তথায় সমাজের কোনপ্রকার শাসন-ভয়ই রহিল না। আশ্রমের কোন কাজই সমাজপতিগণ অচল করিতে পারিল না।

ঈশ্বর মণ্ডলের মত একটা তিলী জাতীয় লোকের পক্ষে এইরূপ অশাস্ত্রীয় কাজকর্ম্ম দেখিয়া গ্রামের কতিপয় উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ক্ষেপিয়া উঠিলেন। তাঁহারাও গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতে ছাড়িলেন না যে ঈশ্বর মণ্ডল ও তাহার পুত্র হরিদাসের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। তাহারা প্রলোভন দেখাইয়া কতকগুলি ধর্ষিতা, পতিতা ও জাতিভ্রষ্টা নারী সংগ্রহ করিয়াছে; আর তাহাদের দ্বারা পাপকার্য্য করাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। তাঁহারা আরো প্রচার করিলেন যে ঈশ্বর মণ্ডল ভণ্ড তপস্বী সাজিয়া এবং ঠাকুর পূজার মন্ত্র ও পদ্ধতি না জানিয়া গোবিন্দজীর বিগ্রহচরণে দুই চারিটা ফুল ও তুলসী দিতেছে, আর মূর্খ লোকদিগকে দেখাইতেছে যে সে একজন প্রকৃত ভক্ত পূজারি ও যোগী। আর ঐরূপ কতক-গুলি মূর্খ লোক কর্তৃক সে প্রেমানন্দ স্বামী বলিয়া অভিহিত হইতেছে। সে শাস্ত্রবিধি-নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান না করিয়া পবিত্র শাস্ত্রেরই অবমাননা করিতেছে। সুতরাং এইরূপ কপটীকে দেশে স্থান দিয়া বা তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া কেহ যেন দেশটাকে কলুষিত না করে। তাঁহারা আরো প্রচার করিল যে, হরিদাস পশ্চিম দেশ হইতে যবন-অন্ন গ্রহণ করিয়া জাতি-

ভ্রষ্ট হইয়া আসিয়াছে; সুতরাং কেহ যেন তাহার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তাহার সঙ্গগ্রহণ না করে। এইভাবে তাঁহারা ধোপা, নাপিত, পুরোহিতদিগকে ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়া দিল, তাহারা যেন ঈশ্বর মণ্ডলের বাড়ীর কোন ক্রিয়া-কর্ম্মে যোগ না দেয়। কিন্তু তাঁহাদের এইরূপ ঈর্ষামণ্ডিত মিথ্যা বার্ত্তা-প্রচারে ও সমাজ-শাসনে ঈশ্বর মণ্ডল বা হরিদাসের অনুষ্ঠিত কর্ম্মগুলির কোন ক্ষতি হইল না।

আশ্রমের নারীগণ অবসর মত চরকায় সূতা কাটিতে লাগিল। সেই সূতা দ্বারা আশ্রমস্থ জোলা তাঁতিগণ বস্ত্র-বয়ন করিতে লাগিল। তাহা দ্বারা আশ্রমবাসিগণের বস্ত্রের অভাব দূর হইয়া কতক উদ্বৃত্ত হইতে লাগিল। ঐ উদ্বৃত্ত বস্ত্র বাজারে বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ দ্বারা গোবিন্দজীর পূজার্চ্চনায় ও দরিদ্র নারায়ণ সেবায় ব্যয় হইতে লাগিল। পুরুষগণের মধ্যে অনেকে নিকটস্থ কৃষিক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক লাঙ্গল ও কোদালী দ্বারা জমী কর্ষণ ও শস্যোৎপাদন করিতে লাগিল। কেহ কেহ সুন্দর সুন্দর বাগান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নানাবিধ তরকারি, ফল ও ফুলের বৃক্ষাদি রোপণ ও সৃষ্টি করিতে লাগিল। মাঠ ও বাগানের শস্য ও অন্যান্য জিনিষ-পত্রে ঠাকুর গোবিন্দজীর আশ্রমের অনেক অভাব দূর হইতে লাগিল।

ইহা ব্যতীত আশ্রমে কতকগুলি দুগ্ধবতী গাভী ছিল। তাহাদের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গোশালা ও গোচারণ মাঠ

নির্ম্মিত হইয়াছিল। কতক নরনারী সমস্ত দিন ঐ সব গোপালনে ব্যস্ত থাকিত। অপরির্য্যাপ্ত দুগ্ধ দেবতার সেবায় ব্যয় হইয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইত তাহা গোয়ালাদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থ সঞ্চয় করা হইতে লাগিল।

সার্ব্বজনীন হিন্দুদেবালয়ের ও তৎসংলগ্ন আশ্রমের এইরূপ অভাবনীয় উন্নতি দর্শন করিয়া গ্রামস্থ একদল বিদ্বেষী গোঁড়া হিন্দু সেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। এইভাবে পাঁচ বৎসরের মধ্যে সেই পরিত্যক্ত সমগ্র দ্বিপাড়া গ্রামখানা সার্ব্বজনীন হিন্দু আশ্রমে পরিণত হইল।

পশ্চিম ভারতের ধনিগণ ধর্ম্ম ও দেবালয় জন্য মুক্তহস্তে যেরূপ অর্থ দান করেন, পূর্ব্ব ভারতের ধনিগণ তদ্রূপ করেন না। এইরূপ আরো কয়েকটী আশ্রম বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা করা বিশেষ দরকার বিবেচনা করিয়া প্রেমানন্দ স্বামী পুনরায় মথুরার দিকে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। চেষ্টা করিলে এই উদ্দেশ্যে তথায় তিনি যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। তাই ইহার দশ বৎসর পরে আশ্রমের আর্থিক উন্নতিকল্পে প্রেমানন্দ স্বামী, সাধু হরিদাসকে গোবিন্দজীর সেবাইত ও আশ্রমের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া, এবং গোবিন্দজীর পরিচারিকাগণের মধ্যে কন্যা রাধারাণীকে প্রধানা পরিচারিকা রূপে রাখিয়া পুনরায় মথুরার আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

হরিদাস পিতৃ-আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া দেবসেবা ও আশ্রমের যাবতীয় কাজকর্ম্ম খুব নিপুণতা সহকারে সম্পাদন করিতে লাগিল. চতুর্দ্দিকে লোক ও অর্থ প্রেরণ করিয়া এইরূপ হিন্দুদেবালয় ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু দুই এক স্থান ব্যতীত অন্য কোথায়ও তাহার চেষ্টা সফলতা লাভ করিল না। তাহার প্রধান কারণই আরো অধিক অর্থ ও কর্ম্মীর অভাব। তাহার নিজ ভবনস্থ আশ্রম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এইজন্য সাধু হরিদাস দ্বিপাড়ার আশ্রমের উন্নতিকল্পে প্রাণপাত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে লাগিল। এতকাল পরে যে ভগবান দয়া করিয়া তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন ইহা ভাবিয়া তাহার উৎসাহ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

অনেক পর্য্যটন, অনেক বাধাবিঘ্ন সহ্য করিয়া হরিদাস এতকাল পরে তাহার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছে। এতদিনে সে প্রাণ ভরিয়া গোবিন্দজীকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে। গোবিন্দজীর চরণে সে ইচ্ছামত পুষ্পাঞ্জলি দিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার মত শত শত অব্রাহ্মণ দ্বারা এইভাবে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াইতে পারিতেছে। আর সে পারিতেছে, প্রত্যহ শত শত নর-নারায়ণের সেবা করিতে। গোবিন্দজীর অনুগ্রহে তাহার দোকানগুলির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। আশ্রমের “গোলাঘর”গুলি নানাবিধ শস্যে পরিপূর্ণ

হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে আজ তাহার সকল অভাবই পূর্ণ হইয়াছে। শৈল-শীর্ষ-ভ্রষ্ট নিম্নগামী দ্রবীভূত তুষার বারিরাশির মত সকল বাধা-বিঘ্ন বিধ্বস্ত করিয়া তাহার অনুষ্ঠান যে ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে ইহা আজ সে স্মরণ করিয়া হৃদয়ে অতুল আনন্দ ও উচ্চ গর্ব্ব অনুভব করিতে পারিতেছে।

সান্ধ্য-সমীরণ যখন আশ্রমের চতুর্দ্দিকস্থ বাগানগুলি হইতে নানাবিধ ফুলের সৌরভ সমস্ত আশ্রমে বিস্তার করিতে থাকে; ধূপ, গুগ্‌গুল ও চন্দন-অগুরুর সুগন্ধে যখন আশ্রম ভরপূর হইয়া উঠে; শঙ্খ-ঘণ্টা ও কাঁসরের শব্দে যখন আশ্রম প্রতিধ্বনিত হইয়া পড়ে; উপস্থিত ভক্ত নরনারী যখন জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে গদগদকণ্ঠে "নমো গোবিন্দায় নমঃ" মন্ত্রে বিগ্রহের পদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে; নারীকণ্ঠ-নিঃসৃত মধুর হুলুধ্বনিতে যখন মন্দির মুখরিত হইয়া উঠে; আর খোল, করতাল, মৃদঙ্গ সংযোগে ভক্তগণ যখন নৃত্য করিতে করিতে গোবিন্দজীর লীলা-কীর্ত্তন করিতে থাকে; তখন সাধু হরিদাস আত্মহারা হইয়া পড়ে। তখন সে দেখিতে পায়, তাহারই গোবিন্দজী যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। ঐ নীলাকাশের তারকারাজিতে, চন্দ্রমার স্নিগ্ধ মুখচ্ছবিতে, আর প্রকৃতির কমনীয় সান্ধ্য-কান্তির স্তরে স্তরে তাঁহারই বিকাশ উদ্ভাসিত হইয়া এই সুন্দর জগতকে আরো সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। তখন সাধু হরিদাস ঠাকুর-গোবিন্দজীর

চরণতলে নিপতিত হইয়া গদগদকণ্ঠে আরাধনা করিতে থাকে ঃ—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য
বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্ত রূপ ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্র কৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥

হরিদাস তখন মানস-নেত্রে আরো দেখিতে পায় সর্ব্বভুবন-ব্যাপী যেমন এক গোবিন্দজী, তথায় অন্য কোন ঈশ্বর নাই ; সেইরূপ এই হিন্দুস্থানে মাত্র এক হিন্দুজাতির, বাস, তথায় কোন প্রকার শ্রেণীভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা নাই। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের ভেদাভেদ পূতিগন্ধের মত কি একটা বিষ কোথা হইতে পবন-হিল্লোলে উড়িয়া আসিয়াও গোবিন্দজীর রাজ্যে স্থান পাইতেছে না। সেখানে সব শ্রেণীর হিন্দুই এক। সব হিন্দুরই এক দেব-মন্দির, তাহারই নাম সার্ব্বজনীন হিন্দু-দেবালয়। তাই সেই দেশের নামও "হিন্দুস্থান"। হিন্দুধর্ম্মই উদার ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মের ভিত্তি হয়েছে জীবে প্রেম। সেই ধর্ম্মেরই কথা "জাতি পাতি পুছে নহি কোই, গোবিন্দকা ভজে সো গোবিন্দকা হোই"। ভগবান কাহারও জাতি পাতি

জিজ্ঞাসা করেন না। যে ভগবানকে ভজনা করে ভগবান তাহারই হন।

তখন সাধু হরিদাস কৃতজ্ঞহৃদয়ে ঠাকুর গোবিন্দজীর চরণতলে পড়িয়া এই বলিয়া আরো প্রার্থনা করিতে থাকে, "ঠাকুর—দয়াল ঠাকুর, তোমার হিন্দুস্থানের বর্ত্তমান হিন্দু-জাতির সমাজ সংস্কার করিয়া দাও। তাহারা অস্পৃশ্যতার তীক্ষ্ণ বিষে দিন দিন জর্জ্জরিত হইয়া অতীব দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। সেই দুর্ব্বলতার দরুণ তাহারা নির্বীর্য্য হইতেছে। দৈহিক শক্তি ও মানসিক সাহস তাঁহারা ক্রমে ক্রমে হারাইতেছে। জননী-ভগিনীদিগকে গুণ্ডাগণের পাশবিক অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে তাহারা আজ সম্পূর্ণ অপারগ। যে হিন্দুর নামে এক যুগে যবন, ম্লেচ্ছ ও অনার্য্য জাতিগণ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িত; যে হিন্দুজাতির সভ্যতা, উদারতা ও সহিষ্ণুতা একদা অন্যান্য জাতির নিকট শিক্ষণীয় হইয়াছিল; যে হিন্দুজাতি সাহিত্য, গণিত, দর্শন, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, ভৈষজ্যতত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন; যে হিন্দুজাতি সঙ্গীত-বিদ্যায়, চিত্র-বিদ্যায়, ভাস্কর-বিদ্যায়, নৌ-বিদ্যায় ও বিমান-যান প্রস্তুত প্রণালীতে বিশ্বজগতে অদ্বিতীয় ছিল—সেই হিন্দুকে অধঃপতন হইতে উদ্ধার কর। হিন্দুসমাজ আজ অস্পৃশ্যতা দোষে এত দুর্ব্বল, এত হীনবীর্য্য যে তজ্জন্য তাহারা অন্য জাতির নিকট উপহাস্য হইয়া পড়িয়াছে। তাই তোমার পায়ে পড়ে প্রাণের প্রার্থনা জানাইতেছি, দয়াল ঠাকুর,

দয়া করিয়া হিন্দুসমাজ হইতে অস্পৃশ্যতা ও অন্য যত কিছু পাপ প্রচলিত রহিয়াছে সবই দূর করিয়া দাও। বাল-বিধবা ও ধর্ষিতা নারীগণের নীরব নয়ন-বারি-নিঃসৃত দারুণ অভিসম্পাত হইতে হিন্দুসমাজকে মুক্ত করিয়া হিন্দুজাতিকে অকাল ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা কর। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত হিন্দুর রক্তহীন পাণ্ডুর দেহে তাহার পূর্ব্বের নষ্ট শৌর্য্য-বীর্য্য পুনরায় বিকসিত করিয়া দাও। তোমার অপার করুণা-প্রস্রবণে স্নাত হইয়া তাহাদের নিদ্রিত বীর্য্য আবার জাগিয়া উঠুক।”

ব্রহ্মচর্য্যই শ্রেষ্ঠ তপস্যা; তাই ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাবলম্বী সাধু হরিদাস মৃত্যু পর্য্যন্ত চিরকুমার থাকিয়া প্রতি প্রাতঃ-সন্ধ্যায় এইভাবে আরো কত আকুল প্রার্থনা তাহার অভীষ্ট-দেবতার চরণে লুটাইয়া পড়িয়া জানাইতে লাগিল।

আর প্রত্যহ সন্ধ্যায় ঠাকুর গোবিন্দজীর পবিত্র আরতির শঙ্খ, ঘণ্টা ও কাঁসরের মধুর ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমবাসী শত শত নরনারীর সম্মিলিত কণ্ঠধ্বনি নিনাদিত হইতে লাগিল,—“জয় সার্ব্বজনীন-হিন্দু-দেবালয়কী জয়”, “জয় গোবিন্দ-মন্দিরকী জয়।”

সমাপ্ত।